কল্যাণীয়া লীনাকে

মুখবন্ধ

"কড়া জোলাপ আর মেয়েমানুষের মেজাজ, এ দুটো সর্ব্বদাই এড়িয়ে চলি। কেননা তাদের আরম্ভটা মৃদু, মনে সন্দেহই জাগে না, কিন্তু পরিণাম যেখানে গিয়ে দাঁড়ায় তার বিনিময়ে লটারীর প্রাইজ ছেড়ে দিতেও রাজী আছি।

"কড়া জোলাপের স্বরূপ সম্বন্ধে বাল্যকালেই চৈতন্যোদয় হয়েছিল। বড়'দের অনুপস্থিতিতে দরজা বন্ধ করে আমরা দু'ভাই মিলে দুটো সিগারেট পাকিয়ে ধরিয়েছিলাম। "মে ব্লসম্"-এর মিঠে গলা-জুড়ানো স্বাদের তারিফ করবার মত বয়েস তখন ছিল না। গোটাকয়েক টান দিতেই মাথার মধ্যে ঝিম্ ঝিম্ করতে লাগ্‌ল আর মুখ আর ঠোঁট বিশ্রী রকমের তেতো হয়ে গেল। টেবিলের উপর ছিল এক শিশি ক্যাষ্টর অয়েলের বড়ি। অগ্রজের প্ররোচনায় চেখে দেখা গেল মিষ্টি। মিষ্টত্বের লোভে আর সিগারেটের গন্ধ চাপা দেবার উত্তেজনায় মাত্রাজ্ঞান হারিয়েছিলাম। ফলে মধ্যরাত্রে দু'ভায়ের নাড়ী ছাড়বার উপক্রম। ডাক্তার এসে অনেক কষ্টে থামিয়েছিলেন। সেই থেকে হাজার শারীরিক অস্বস্তি সত্ত্বেও ও-পথে আর মাড়াই না।

"মেয়েমানুষের মেজাজ আর তার ফলাফল সম্বন্ধে যখন সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করেছিলাম, তখন বয়েস বেড়েছে কিন্তু পুরো দায়িত্বজ্ঞান জন্মায় নি। তা হলেও কৈশোর আর যৌবনের সন্ধিক্ষণে স্ত্রীলোকের বিষকণ্ঠের আর তীব্র মেজাজের যা' পরিচয়

পেয়েছিলাম তাতে এটুকু বুঝেছিলাম, যার কপালে ও-রকম স্ত্রী জোটে তার জীবন কতটা দুর্ব্বিষহ। সেখানে কোনো ডাক্তারী কোন পার্থিব প্রতীকারই নেই, এক নিজের গলায় দড়ি ঝোলানো ছাড়া।"

* * *

সেদিন সন্ধ্যায় অনিলের বৈঠকখানা ছিল খালি। শুধু আমিই হাতে কিছু কাজ ছিল না বলে অমন দুর্যোগেও নিত্যকার হাজিরা দিতে তার কাছে গিয়েছিলাম। কিন্তু গিয়ে আটকে গেলাম। যেহেতু এমন ঝম্-ঝম্ করে বৃষ্টি নাম্ল, আর কাছে পিঠে না আছে যান-বাহন, সেহেতু বালিগঞ্জের নিরালা আভিজাত্যকে মনে-মনে অভিশাপ দিয়ে উঠতে গিয়ে আবার আসন দখল করলাম। ঘরেও আমার এমন কোন বিশিষ্টা আত্মীয়া নেই যার ভ্রূকুটি আকাশের চেয়ে ভীষণ অথবা কুটিলতর। কাজেই বসে বসে অনিলের কথা শুন্‌ছিলাম। সেদিন তারও মেজাজ ভালো ছিল না এবং তারি ফলে ঈজি-চেয়ারে অর্দ্ধশয়ান অবস্থায় ঘরের কোণে সে এক ধূমরাজ্যের অধীশ্বর হয়ে স্ত্রীলোকের মেজাজ নিয়ে মন্তব্য করে চলেছিল। আমিও অবিবাহিত এবং নারী-সম্পর্কিত অভিজ্ঞতা আমার এতোই রোমাঞ্চপ্রবণ এবং অনুপলব্ধ, যে তার কথাগুলো কতকটা সন্দেহ কতকটা অবিশ্বাসের মনোভাব সৃষ্টি কর্‌ছিল।

* * *

"বৃহৎ পরিবারের মধ্যে বাস করে অল্প বয়স থেকেই আমার

সংসারের অভিজ্ঞতাটা পেকে উঠেছিল। বিশেষ করে স্ত্রীলোকের চরিত্র ও মনোভাব কত বিচিত্র, এর আভাস পেয়েছিলাম নানা খুঁটিনাটির মধ্য দিয়ে, যেখানে নাকি তাদের মনের সত্যি প্রকাশ। পুরুষের স্বভাব নিয়ে কোনোদিন মাথা ঘামাই নি, কারণ স্বজাতি বলেই হোক্ বা জটিলতার অভাবের জন্যেই হোক্, তাদের মোটামুটি বুঝতে পারা খুব কঠিন নয়। টাইপ্‌স-হিসেবে তারা অপেক্ষাকৃত সরল, দুর্ব্বল আর হাস্যকর। কিন্তু মেয়েদের কথায় আর আচরণে, চিন্তায় আর ব্যবহারে যে বিরোধ আর নিত্যদ্বন্দ্ব, তাকে বুঝে ওঠা কঠিন বৈ কি! আবার ঠিক্ সময়ে, অনুকূল আবহাওয়ায় একটু নজর রাখলেই তাদের মনের জটিলতম গ্রন্থি হঠাৎ খুলে যায়। যাকে দেখলে মনে হয়—উদাসীন, নির্জ্জীব আর দুর্ব্বল, তারই মধ্যে আকস্মিক শক্তি-সঞ্চারে বিস্মিত হতে হয়। যাকে দেখলে অত্যন্ত রাশভারী, জবরদস্তি গৃহিণী বলে আতঙ্ক হয়, হয়ত তার মতো নীরক্ততম, সরল আর আপন-ভোলা মানুষ নেই।

"স্ত্রীলোক বলেই যে তাদের স্বভাব, কথাবার্ত্তা আর কার্য্য-কলাপ আমাদের লক্ষ্য আর সমালোচনার বস্তু, তা' কিছু পরিমাণে সত্যি হলেও সবটা নয়। নিত্য সংস্পর্শের ফলে মেয়েদের সম্বন্ধে যে সশ্রদ্ধ আর রহস্যময় মনোভাব থাকে তার বিলোপ ঘটতে পারে, যদি তোমার চোখ দুটি খোলা থাকে, যদি কিশোর বয়সে অথবা যৌবনের প্রারম্ভে অতিরিক্ত ভাবপ্রবণ কবিতা বা সাহিত্যসেবা না করে থাকো। আমার যেটুকু

অভিজ্ঞতা, সেটা হ্যাভলক্ এলিস কিংবা ফ্রয়েডীয় দর্শনের সাহায্যে অর্জ্জন করি নি, করেছি আমাদের এই অতি-পুরাণো সমাজ আর সংসারের মধ্যস্থতায়, কেননা তারাই হলো জীবনের পয়লা নম্বরের মাষ্টার।

"আশ্চর্য্য! কতো অদ্ভুত এই মেয়েমানুষের স্বভাব আর মন! যাকে ভেবেছি ছলা-কলায় নিপুণ, হাসিতে স্পর্শে ভঙ্গিমায় চিত্তহরণই যার অনন্তব্রত, মিশে দেখেছি তার মতো নরম, প্রাণ-বান্, উষ্ণ-কোমলতার জীবন্ত মেয়ে আর নেই। যাকে মনে হয়েছে অস্বাভাবিক গম্ভীর, অত্যন্ত শোভন ও সংযত, জীবনে কখনো যার মাথা নীচু হবে না পুরুষের কাছে, আপনারই দাম্ভিকতায় যে অটল, শুনেছি নাকি তার শঙ্খিনী মায়ায় কবলিত হয়েছে অনেক নিরীহ ভদ্রসন্তান, মরীয়া হয়ে সর্ব্বনাশের পথে নেমেছে। সে নিজের অচল স্থৈর্য্যে আঘাত করেছে পুরুষের অপার কৌতূহলকে, ঘটিয়েছে তাদের সাংঘাতিক পদস্খলন। যাকে ভেবেছি শুচি শুভ্রতায় গৌরবময়া, বৈধব্যের নিরুত্তাপ দহনে আত্মসমাহিত, অনেক সন্তানের সেই মাতৃমূর্ত্তি কলুষিত হয়েছে গোপন অভিসারের অভাবনীয় ঘটনায়।

কিন্তু এ তো গেল কয়েকটি খাপছাড়া চরিত্র, কয়েকটী অসংলগ্ন জীবনের অস্বাভাবিক পরিণতি। যাকে দেখে তোমার মনে হবে, এমন নিষ্ঠাবতী, ভক্তিমতী রমণী আর দুটি নেই, যদি জানতে পারো তার ইতিহাসটা ঠিক্ শ্রবণীয় নয়, তুমি কি করতে পারো? পতিব্রতা নারীর সেবায়, মিষ্টতায়, মধুর স্নেহ-

সান্নিধ্যে হয়তো তুমি মুগ্ধ, অভিভূত হয়েছো। কিন্তু তুমি যদি দেখতে পেতে, যে সন্দেহে আর ঈর্ষ্যায়, তাড়নায় আর মিষ্টকণ্ঠের শ্লেষ-উদ্গারে, তিনি তাঁর স্বামীর জীবনকে দিনের পর দিন বিষাক্ত করে দিয়েছেন, তখন তোমার কি মনে হবে?

"কিন্তু এ-কথা যাক্। সাধারণ সাংসারিক জীবনে, পরিবারের তুচ্ছ নগণ্যতাতেই অনেক মেয়ের সত্যিকারের অসামান্য রূপ প্রকাশিত হয়ে পড়ে। যদি কোনো মেয়েকে বুঝতে চাও, তাকে দেখো তার আপন পরিবেশের মধ্যে; সেইখানেই তার প্রকৃত পরিচয়। যতক্ষণ না কোনো স্ত্রীলোকের হাতে তার স্বামীর টাকা ও চাবি না আসছে, ততক্ষণ তুমি তাকে চিনতে পারো না, পারবে না। তুমি যতো খুসী সে-মেয়েটীকে দেবী ভাবো, শ্রদ্ধা ও প্রীতি সমর্পণ করো—আমার আপত্তি নেই। কিন্তু আমার অনুরোধ—তুমি বিচার করো তাকে স্বরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত দেখে। কোথায় মেয়েদের দুর্ব্বলতা, কোথায় তাদের তেজ; কি তাদের সত্যিকারের চেহারা, কতো তীক্ষ্ণ তাদের নিষ্করুণ বাক্যবাণ আর কতো নির্ম্মম তাদের সূক্ষ্ম অপমান—এর কিছুটা আন্দাজ পাওয়া যাবে বৃহৎ গোষ্ঠীর আজব চিড়িয়াখানায়। স্বদেশে অথবা প্রবাসে স্বামীর ঘরে একচ্ছত্র অধীশ্বরীর চরিত্র যাচাই হয় না।"

"মেয়েদের সব চেয়ে তেজ তাদের সন্তান-গৌরবে নয়, তাদের স্বামির কৃতিত্বে বা ঐশ্বর্য্যে নয়। এগুলো উপকরণ, আত্মতৃপ্তির ইন্ধন জোগায় শুধু। তাদের সত্যিকারের দম্ভ ও শক্তি আহরণ করে তারা বাপের বাড়ী থেকে। শিক্ষিতাই হোক আর গ্রাম্য

রমণীই হোক, আধুনিকা হোক অথবা সনাতনী প্রৌঢ়া কি বৃদ্ধা হোক, পিতৃগৃহের স্মৃতি ও বিস্তারিত উল্লেখ তাদের জীবন-যাত্রার কমা ও সেমি-কোলন। ও না হলে তাদের চলে না। পিতৃ-গৃহের ঐশ্বর্য্যটা হ'ল বাহ্য-অলঙ্কার। থাকলে ভালোই, তুলনামূলক সমালোচনার সহায়তা করে মাত্র। আসলে তার কল্পিত মাহাত্ম্যটাই মারাত্মক। এর শিকড় কতদূর মনের ও স্বভাবের শিরায় স্নায়ুতে সঞ্চারিত হয় আর কি বিশ্রী তার কার্য্যকরী শক্তি, তা ঠিক ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না।

"মেয়েদের স্বভাব-শত্রু মেয়েই—বান্ধবীর হালচাল তারা সহ্য করতে পারে কিন্তু পারে না জ্ঞাতি-রমণীর এমন কি ভগ্নীর এতোটুকু ন্যায্য অহঙ্কার। সহজ কথা তাদের পরিণত হয়ে যায় কদর্থে, সত্যভাষণ দেমাকেরই নামান্তর দাঁড়ায়। পুরুষের নীচতা তারা ক্ষমা করতে পারে, তাদের কঠোরতম বাক্য নীরবে হজম করে যায়, কিন্তু কোনো মেয়ে সামান্য কথা শুনিয়ে গেলে তাদের অবিচলতা যায় খ'সে, ফুঁসে ওঠে মনের মধ্যে—শান্তি নেই যতক্ষণ না পাল্‌টা জবাব দেওয়া যায়। এবং সে মানসিক অশান্তি আর স্তব্ধ তীব্রতার অংশ নিতে হয় পুরুষকে।

"তোমাকে আর একটা কথা বলি—মেয়েদের কর্তৃত্ব-স্পৃহা বন্ধ্যা নারীর সন্তানকামনার চেয়েও তীব্র। অভিমান, ঐশ্বর্য্য—এগুলো সৌখীন বিলাসের উপকরণ। কর্তৃত্ব তাদের জন্মগত অধিকার। ওটা আহারের মতোই অপরিহার্য্য প্রাণবস্তু। ঐখানে আঘাত লাগলেই নিরীহ ও শান্ত মেয়ে সংসারে খাণ্ডবদাহের সৃষ্টি

করতে পারে। বাপের বাড়ীতে থাকবে তাদের অপ্রতিহত দাবী; শ্বশুর বাড়ীতে অটুট থাকবে তাদের প্রভুত্ব—এই হ'ল তাদের অবচেতন ও সচেতন বাসনা। শিক্ষায় তারা হার মানতে রাজী, [illegible]ায় পরাস্ত হলে শুধু মন খারাপের ওপর দিয়ে যাবে—কিন্তু ভাঁড়ার আর পরিচালনার মৃদু আলোচনাও যদি অতর্কিতে কর্ণগোচর হয়, তবে সেদিনটা পুরুষের বাইরে-বাইরে কাটানোই নিরাপদ্।

"যদি বলো—এতে ক্ষুব্ধ বা বিচলিত হবার কি আছে? আছে বৈ কি। যদি তুমি মার খাও শেয়ারের বাজারে, অথবা য়ুনিভ্যরসিটির গণ্ডী-উল্লম্ফনে অপ্রত্যাশিত ভাবে পা'টা যায় বেধে, কিংবা কর্ম্মস্থলে তোমার যথাযথ কদর হচ্ছে না এবং কৃতিত্ব-অনুপাতে ছাগবুদ্ধি কয়েকটি লোক অনায়াসে তোমার ঘাড়ের ওপর দিয়ে ডিঙিয়ে যাচ্ছে, তাহলে তুমি যথেষ্ট পরিমাণেই পীড়িত ও ব্যথিত হবে, কিন্তু তার প্রতিক্রিয়াটা অন্যের ওপর চালাবে না নিশ্চয়ই।

"তুমি অবশ্য বল্‌তে পারো—আমার দৃষ্টিটা একচোখা রকমের তীব্র, কিন্তু পক্ষপাতিত্বের অজুহাতে তুমি আমার মন্তব্যের সত্যতাকে উড়িয়ে দিতে পারো না। মেয়ে-জাতি মাত্রই নরকের দ্বার, এরকম কথা কেবল মনুসংহিতার যুগেই চল্‌ত। তাদের শিক্ষা-দীক্ষায়, তাদের ভবিষ্যতে আমি আস্থা রাখি। কিন্তু তাদের স্বভাবগত অসামঞ্জস্য, ত্রুটি বা অভাবের উল্লেখ করার অধিকার আমার নিশ্চয়ই আছে। ছেলেদের চরিত্রে যে কোনো

দোষ বা গলদ নেই, একথা বাতুল ছাড়া কেউ বল্‌বে না। কিন্তু তারা প্যারাসাইট্‌ নয়, তারা স্বাশ্রয়ী। সমাজতত্ত্বের দোহাই দিয়ো না; বিধাতার গড়নে দোষ চাপিয়ো না। পুরুষের চেয়ে মেয়েরা অনেক বেশী ছোটো কথা নিয়ে মাথা ঘামায়। আপনি তো অশান্তি ভোগ করেই, পুরুষকেও তার অংশ জোর করে চাপিয়ে দেয়। তুমি যদি বৃহত্তর গণ্ডীতেও তাদের টেনে আনো, তবুও সংস্কার আর স্বভাবগত দুর্ব্বলতা ঘোচাতে পারবে না। কোনো আইন-ই তাদের মাথা উঁচু করিয়ে দিতে পারে না,—যেহেতু তাদের অভাব-অভিযোগ সব দূর হয়ে গেলে কি নিয়ে তারা মার্ট্যর হবে? সমাজ-সংস্পর্শে মেয়েদের তুমি শ্রদ্ধা কর্‌তে পারো—সেখানে তারা কনশ্যস্‌। কিন্তু ঘরের মধ্যে দান-প্রতিদানের বালাই আছে, মিথ্যাচরণ আছে, আর সব-চেয়ে বড় কথা—আছে সাফাই আর যাচাই।

*　　　*　　　*

এমন বাদ্‌লার দিনটা মাঠে মারা গেল! কোথায় আমার রসঘন অনুভূতিগুলো মনের কোণে উঁকি দিচ্ছিল, আর কোথায় এই বিদ্বেষতিক্ত অবিবাহিতের সত্যকল্প অপ্রিয়ভাষণ! "এমন দিনে তারে বলা যায়" ত বটেই, এমন দিনে তারে কাছে যে চাই! কিন্তু মুস্কিল এই, হাতের কাছে আলাপী এমন মেয়ে নেই যাকে আর কিছু না হোক দু'টো মিষ্টি কথা চাপা সুরে গুন্‌গুনিয়ে বল্‌লে হঠাৎ উঠে গিয়ে কোনো আত্মীয়কে ধরে আন্‌বে না! আমার হচ্ছে সেই অবস্থা যে-সময়ে মন একটা কিছু ধরতে চায়,

তা' সে শাড়ীর লীলায়িত আঁচলই হোক্ অথবা অস্পৃশ্য একটা হাসির বিদ্যুৎরেখাই হোক্। বাইরে বেরুবার আগে গোটা কয়েক কবিতার লাইনও তৈরী হ'য়ে উঠ্ছিল—

"দিনের বেলায় তারাবা কোথায় যায় ?
তা'রা কি তোমার মধুর অধর পিছনে
শুচি ও শুভ্র মুক্তামাধুরী দশনে
লুকোচুরি খেলে ক্লান্ত হেসে ঘুমায় ?"

কিন্তু অনিলের প্রবল বাক্য-স্রোতে তারা বিনা বাধায় ভেসে গেল। আমি নিরুপায়—কি আর ক'রতে পারি! সে এতো সীরিয়স্ হ'য়ে আমাকে বক্তৃতা দিচ্ছে যে সে-সময়ে কোনো প্রতিবাদ ক'রলে আমাকে অক্ষত দেহে বাড়ী ফিরতে হবে না। তা'ছাড়া বাল্যবন্ধু হলেও তার মনের এদিক্‌টা আমার সম্পূর্ণ অজ্ঞাতই ছিলো। অনিলের মন্তব্যগুলো এতই জোরালো যে না শুনে উপায় নেই; উপরন্তু অতিভাষণ হ'লেও তাতে সত্যের ছোঁয়াচ রয়েছে। কিন্তু সেই সঙ্গে মনের মধ্যে আমার খানিকটা অসহিষ্ণুতা, খানিকটা সন্দেহ হচ্ছিল। কিম্বা হবেও না! তার জীবনে এমন কিছু তিক্ত অভিজ্ঞতা আছে, যা' একান্তই ব্যক্তিগত ও আমি তার কিছুই জানি না। তবু মোড় ফেরাবার জন্যে বল্‌লাম—"স্ত্রী-বিদ্বেষীর মন্তব্য আংশিকভাবে সত্য হয়, কিন্তু—

"কিন্তু-টিন্তু নয়; তুমি এর কিচ্ছুই বোঝো না। জীবনে কখনো একটী মেয়েরও স্বভাব ও কথাবার্ত্তা বুদ্ধি দিয়ে অনুধাবন

করোনি। সেইজন্যেই তোমার মনোভাব অত্যন্ত জোলো ও ফিকে রকমের রোমান্টিক্। আশা করি তুমি সুখী হবে, কেন না মেয়েদের মতো কাউকে জড়িয়ে ধরতে পারাতেই তোমার সার্থকতা। তুমি ভবিষ্যতে রোমান্টিক্ কবিতা লিখ্‌তে থাকবে, কিন্তু পৌরুষ বিদ্রূপ তোমার ধাতে নেই। তুমি কাঁদবে আর সাধ্‌বে—তোমার বৌ হাস্‌বে আর তোমাকে একটা অসহায় সম্পত্তিবোধে সাজিয়ে-গুজিয়ে আলমারীতে চাবি-বন্ধ রাখ্‌বে। কিন্তু সে কথা যাক্— আমি এতক্ষণ যে ব'কে মরলুম, তার কারণ আমার প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয় খসড়া করা। স্ত্রী-জাতির সম্বন্ধে আমার অন্য মতামতও আছে। কিন্তু সেগুলো এতই সূক্ষ্ম রকমের ও মনো-রাজ্যের ব্যাপার যে তুমি তাতে অবৈধ প্রশ্রয় পাবে আর মাসিকের পাতা ভরাবে। তবে আমি ইন্দ্রিয়বাদী স্ত্রী-বিদ্বেষী নই। আমি দেহাত্মবাদী। কিন্তু কতকগুলো নিরীহ মেয়েকে কে যেন ক্ষেপিয়ে তুলেছে,—আশঙ্কা করছি কোনো ভিক্টোরীয়ান্ নিষ্ফলা মহিলা। ফলে এমন একটা উগ্র কাগজ বা'র করেছে আর বিশুদ্ধ ননসেন্স-ভর্ত্তি পুরুষ-কুৎসা ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত হচ্ছে যে একটা থীসিস্ লেখা দরকার হয়েছে। তাই এই নিরালা অবসরে তোমার মতো পাথুরে-বুদ্ধির ভাবপ্রবণতায় আমার মন শানানোর জরুরী তাগিদ ছিলো। কিন্তু কথা হচ্ছে আমার থীসিস্ ছাপবে কে, দেখ্‌বে কে? তোমার কবিতার কল্পিত নায়িকারা?"

* * * *

এই স্মরণীয় সন্ধ্যার পর অনেক দিনের ব্যবধান। অনিল

সনাতন হিন্দুমতে চোখ বুজে ঢিল ছুঁড়েছে এবং আবহমান কালের শিক্ষায় আর ঐতিহ্যে পরিপুষ্টা একটি গৃহিণীকে নিয়ে আপাতসুখে কালক্ষেপণ করছে। আর আমি—হঠাৎ-দেখা একটি মেয়েকে নিয়ে দিনকয়েক হাবুডুবু খেয়ে অপর একজনকে বিবাহ করেছি যার পিছনে এতোটুকু ইতিহাস নেই। সে আমার কবিতা কখনো শোনে, কখনো শোনে না। আমি তবু লিখি, কেন না এখনও ভাবতে ইচ্ছে করে যে আমার পাশে যেন একটি মেয়ের নিবিড় সঙ্গ অস্পষ্টভাবে অনুভব করছি। মসৃণ শঙ্খের মতো যার ললাটে বিদ্রোহী অলকগুচ্ছ নীল ছায়ার মায়া রচনা করছে—বিস্রস্ত অঞ্চল—বিস্তৃত চাঁদিনী রাতের আকাশের ওপর দিয়ে ভেসে যায় তার চাহনি—বিস্ময়-বিস্ফার, কৌতুকচঞ্চল। কোমল-শিথিল মুঠি, সুঠাম দেহশ্রী। নিঃশ্বাস ফেলে চম্‌কে উঠি—বেদনা-বিহ্বলতায় নতুন কবিতা পুরাণো ধাঁচে লিখি। আমার স্ত্রী সেগুলো ব্যক্তিগত স্তবোচ্ছ্বাস ভেবে আমার কাব্যপ্রতিভা স্বীকার করেন। অনিল কিন্তু সত্যিই কবিতা লিখতে সুরু করেছে যদিও একথা পূর্ব্বে কল্পনাও করতে পারতাম না। সবাই নাকি বল্‌ছে, তার কবিতা দুর্ব্বোধ্য কিন্তু সেইজন্যেই অপরূপ ও দুঃসাহসী। বিদ্রূপের ফলায় আর ব্যঙ্গের উত্তাপে বাঙলা ভাষায় নাকি এক নতুন খড়্গাকাব্যের সূত্রপাত হয়েছে।

*   *   *   *

কী কুক্ষণেই বিবাহের পরে সেই সন্ধ্যার কথা কোনো এক অলস-দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে স্ত্রীর কাছে গল্প করেছিলাম। অনিলের সমস্ত

মন্তব্য শুনে আমার স্ত্রী উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন এবং মন্তব্য করেছিলেন —'কী সাংঘাতিক!' যদিও তার বিবাহ হয়েছে এবং তার মতামত হয়তো বদ্‌লে গেছে এমন আশ্বাস আমার স্ত্রীকে অনেক-বার দিয়েছি কিন্তু তিনি সন্তুষ্ট হ'য়ে মেনে নিতে পারেন নি তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন যে এমন বন্ধুত্বের সংস্পর্শ তিনি সহ্য করবেন না—তার প্রভাব আমার পক্ষে রীতিমত ক্ষতিকর। অনিল যদি মদ্যপ দুশ্চরিত্র হতো তা হ'লে তাঁর এতো ভাবনার কারণ ছিল না, কিন্তু স্থিরবুদ্ধি ইন্‌টেলেক্‌চুয়ল বলেই তাঁর বিশেষ আতঙ্ক ও আপত্তি। অনিলের স্ত্রী-সম্বন্ধে তাঁর প্রচুর অবজ্ঞা। তার মামা সেরেস্তাদার, বাবা সওদাগর আফিসের ছোটো কেরাণী।

অনিলের সেদিনকার মন্তব্যগুলো মধ্যে মধ্যে মনে পড়ে যায়। একদিন জিজ্ঞাসা করেছিলাম স্ত্রীকে—"আচ্ছা, স্বামীর কাজে-কর্ম্মে আর চিন্তাধারায় যদি স্ত্রীর সহানুভূতি না থাকে তা হ'লে কি ক'রে দাম্পত্য-জীবন সুখের হয? তুমি তো এতোটুকু দেখোও না আমি কি করি, কি ভাবি…"

আমার স্ত্রী বল্‌লেন—"পুরুষ বুদ্ধিমান সাহচর্য্য যদি চায়, তাব বিয়ে করা মোটেই উচিত নয়। মনোমত বন্ধু খুঁজে নিয়ে তার সঙ্গে এক ফ্ল্যাটে বাস করা উচিত। স্ত্রীর কাছে যা পাবার, তাই পেলেই হলো। সব সময়েই তো তোমার মুখে মুখ দিয়ে সহানুভূতি জানাতে পারি না। তা ছাড়া তোমাদের রবীন্দ্রনাথ কী বলেছেন জানো তো…? স্ত্রীর কাছে দরদ বা সহানুভূতি যদি মেলে ত ভালোই—সেটা সোনায় সোহাগা—উপরি পাওনা ব'লে।

যদি ভালবাসাই পেয়ে গিয়ে থাকো, তা হ'লে খাঁটি সোনা নিয়ে তৃপ্ত হওনা কেন? শুধু সোহাগার জন্যে এত মিথ্যে ক্ষোভের দরকার?"

আশ্চর্য্য মেয়েদের অন্তর্দৃষ্টি। তবু সন্দেহ ঘুচল না—বল্‌লাম, "কিন্তু কী ক'রে হদিস্ পাবো, সে সত্যিই ভালোবাসে কি না?"

আমার স্ত্রী অবাক্ হ'য়ে আমার দিকে বড় বড় করে তাকালেন। তারপর আচম্‌কা হেসে উঠে চুম্বন-প্রকরণের একটা জ্বলন্ত নমুনায় আমার একেবারে মুখবন্ধ করে দিলেন।

*　　*　　*　　*

আজকাল আমার মনে আর বেশী-কিছু দ্বন্দ্ব জাগে না। আমার স্ত্রী ক্ষুদ্রতম সমস্যারও নির্ভুল সমাধান করে দেন। মেয়েদের সংস্কারক-প্রবৃত্তি খুব প্রবল ও কার্য্যকরী, কেন না তিনি আমাকে মনোমত ছাঁচে ঢালাই করে নিয়েছেন। আমি নিশ্চিন্ত আরামে তাঁরই নির্দ্ধারিত পথে চলেছি। কবিতা অবশ্য এখনও লিখি তবে আর ছাপি না, যেহেতু আমার স্ত্রী বলেছেন অনিলের প্রবর্ত্তিত কাব্যধারার যুগ নাকি শীঘ্রই শেষ হবে—তারপরে আস্‌বে, আস্‌বে আমার বিজয়মাল্যের মাহেন্দ্রক্ষণ।

সুমনার স্বপ্ন

সুমনাকে সকলেরই ভালো লাগে।

তার মানে নয়, তার চরিত্রে এমন কিছু অসামান্যতা আছে যার জন্যে সে সকলকে আকর্ষণ করে। অথবা তার শরীরে এমন কিছু অসাধারণ রূপ-সৌষ্ঠব আছে যাতে সকলেই পতঙ্গের মত ঝাঁপ দেয়।

সত্যি কথা বলতে কি, তার অসাধারণত্ব কোনো বিষয়েই ছিল না। না বিদ্যাবত্তায়, যদিও সে এম্-এ পাশ করেছিল। না চেহারায়, যদিও তার পরম সুশ্রীতা সম্বন্ধে সন্দিহান হবার কোনো কারণ ছিলনা।

বাঙালী ঘরের সাধারণ মেয়ে—অল্প বয়সে বাপ-মা হারিয়ে পিসীর কাছে মানুষ হয়েছিল। তাঁরি কাছে থেকে সে এত বড়টা হয়েছে ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ গণ্ডী পার হয়েছে। আপন পায়ে সে ভর দিয়ে দাঁড়াতে শিখেছে অনেক দিন, কিন্তু তার পাখা গজায় নি। কোনোদিন উড়তে শিখবে—সে ভরসাও কেউ করে না।

সুমনা হল সেই জাতের মেয়ে—যারা ঠিক্ পরনির্ভর না হলেও আপনার জীবনের সঙ্গে আর একটি মানুষের জীবন জড়াতে ভালোবাসে। দোসর না পেলে তাদের চলেনা। নইলে অন্য মেয়ে হলে, কবে ঐ বুড়ী পিসীর চোখের সামনে দিয়ে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে সরে পড়ত। তার স্বার্থপরতার জন্য সুমনা কোনোদিন

বড় বা স্বাধীন হতে পারে নি এবং পারবেও না। পিসী তাকে গ্রাস করেছে। তার কবল থেকে বেরিয়ে আসার সাধ্য বা মনের জোর সুমনার নেই।

সুমনার বয়স সাতাশ আটাশ হতে চল্‌ল, অথচ বিয়ে-থাওয়া করে সংসারী হওয়ার সৌভাগ্য তার ঘটে উঠল না। তার পুরানো বান্ধবীরা মধ্যে মধ্যে আসে এবং সর্ব্বাঙ্গে স্বামি-সোহাগের বিজ্ঞাপন জানায। ছেলে-মেয়েদের দৌরাত্ম্যের কথা সস্নেহে অনুযোগ করে, আর বিবাহিতা জীবনের অশান্তি আর ঝকমারী সগৌরবে নিবেদন করে। সুমনা চুপ করে শুনে যায়—তার দীর্ঘ, আয়ত চোখ দুটি লোলুপতার স্পর্শে চক্ চক্ করে ওঠে। সর্ব্বান্তঃকরণে সে বাইরের জগতের খুঁটিনাটি খবরগুলো গ্রহণ করে। বন্ধুরা চলে যায়—আবার যে-কে সেই।

এক-এক সময়ে তার পরিচিত ব্যক্তিরা তাকে মৃদু তিরস্কার করে। আহ্বান করে বৃহত্তর, মহত্তর জীবনকে উপভোগ করবার জন্যে। যারা তার বাড়ীতে বেড়াতে আসে সেই সব অন্তরঙ্গ বন্ধুরা ভালোবাসে বলেই তাকে উপদেশ দেয়। বলে—"তুই কি শেষ কালটায় ওল্ড মেড্ হয়ে মরবি?" সুমনা মুমূর্ষু হাসি হাসে, হাত উল্‌টে বলে—"কি জানি! কপালে কি আছে!

সুমনাকে ভালো না লেগে পারা যায় না, তার অসহায় নিশ্চিন্ততা ভাবিয়ে তোলে। কৃশকায় ছোটো মেয়েটির দিকে সবাই আকৃষ্ট হয়। দূর থেকে তাকে দেখলে মনে হয়—নেহাৎ

স্কুলে পড়া মেয়ে। কাছে এলে ভালো করে ঠাহর করলে নজর হয়, তার মুখে চোখে সূক্ষ্ম বলিরেখা।

সুমনার কাপড়ের ভাজে শুঁয়াপোকা লেগে রয়েছে। কিন্তু ঝাড়া দিয়ে সেটাকে সরিয়ে দেওয়ার মত তার উত্তমটুকু নিঃশেষ হযে গেছে। জীবনে কোনো রং নেই, কোনো স্ফুর্ত্তি নেই, কেবলি দিনের পর দিন একই অর্থহীন কাজের পুনরাবৃত্তি। এককালে তার সহজ কণ্ঠের অবিরল গান ছিল গৌরবের বস্তু—যে শুন্‌ত সে ভুল্‌ত না। কিন্তু এখন দুখানা গান পর পর গাইলে গলা ধরে আসে, দম বন্ধ হতে থাকে। ছবি আঁকার হাতও ছিল মিষ্টি। একবার কোনো দৃশ্য বা প্রতিকৃতি দেখলেই হুবহু সে জিনিষ কাগজে ফুটিয়ে তুলতে পারত, তুলির টানে ভুল হতনা। সে সব ছবি এখন বিলিয়ে দিয়েছে।

কি রকম একটা বীতরাগ, ভীত ভাব এসে তার মনকে ছেয়ে ফেলেছে। সে কিছুতেই খুঁজে পাচ্ছেনা শান্তি, একটা স্থির আশ্রয়স্থল। পিসীর সঙ্গ থেকে সান্ত্বনা পাওয়ার মত তার বয়স নয়, ইচ্ছা হবার কথাও নয়। তবু সুমনার সাহস নেই। যখন বন্ধুরা এক-আধবার আসে, তার দেহে ও মনে ঈষৎ চঞ্চলতা জাগে—এই পর্য্যন্ত। কিন্তু বাঁধন ভেঙ্গে, বে-পরোয়া হয়ে কোনো কিছু করবার মত তার মেরুদণ্ড কোথায়? তার ইচ্ছাশক্তির চাবিকাঠি পিসীর আঁচলে বাঁধা আছে। আহা বিধবা পিসী—কষ্টে-স্বষ্টে তাকে একদা মানুষ করেছে। তাকে ছেড়ে যাওয়ার কথা মনে উঠলেই সুমনা অন্য কথা ভাবতে সুরু করে।

পিসী লোক-দেখিয়ে প্রশ্নবাণে অস্থির করেন—"দিন দিন তোর কি ছিরি হচ্ছে সুমি? একবার আয়নায় মুখখানা দেখ্ দিকি! তোমরাই বল না মা, যত্ন-আত্তির ত কসুর করি না! সেই এতটুকু বয়স থেকে দেখে আসছি তো, ওর স্বভাবটাই ঐ রকম! আপন মনে থাকতে ভালোবাসে। কিন্তু তাও বলি—একটু-আধটু বাইরে না ঘুরে এলে কি আর শরীর ভালো থাকে?"

শিউলী দাঁতের ওপর দাঁত চাপে। ভাবে, যেমন পিসী তেমনি ভাইঝি। কেন, সুমির কি বয়স হয়নি? সে কি নিজে বুঝতে পারে না, তার কি চাই? না বুড়ী জানে না, শোনে না যে এত বড় মেয়ে আইবুড়ো করে ঘরে বসিয়ে রাখলে নিজের স্বার্থসিদ্ধি হয় বটে, কিন্তু বয়স্থা মেয়ের স্বাস্থ্যবৃদ্ধি হয় না?

শিউলী পিসীকে দুচক্ষে দেখতে পারে না, আর সুমিকে মনে মনে গাল পাড়ে। ন্যাকা পিসীর হাবলা ভাইঝি! রট্‌ন্! ঈডিয়ট্‌স্! চৌষট্টি বছর বয়স হয়ে গেল, অথচ বুড়ীর নড়বার নাম নেই! সুমির দফা সেরে, ওকে খেয়ে তবে নড়বে। এখনো যদি ভালোয় ভালোয় যায়, সুমির জীবনটা অন্য পথে হয়তো ঘুরে যেতে পারে।

কলেজে পড়বার সময় সুমনার সঙ্গে শিউলীর ভাব ছিলো খুব বেশী। এই শান্ত প্রিয়দর্শন মেয়েটিকে প্রথম দর্শনেই শিউলীর ভালো লেগেছিল। শিউলীর স্বভাবটা সুমনার ঠিক্ বিপরীত। এই জন্যেই বোধ করি আকর্ষণটা হয়েছিল তীব্র। শিউলী হল চটপটে মেয়ে—সোজা কথা সাফ বলে দেয় মুখের ওপর, মুখে-চোখে তার

উজ্জ্বল বুদ্ধির দীপ্তি। আকারে সে সুমনার চেয়ে দীর্ঘ, আরও স্বাস্থ্য-বতী। বি-এ পাশ করে দিলো পড়া ছেড়ে, হুড়মুড় করে পড়ল প্রেমে এবং পড়বার সঙ্গে সঙ্গেই গেল তলিয়ে। তবে বিয়ের পরও বন্ধু-প্রীতি ছিন্ন হয় নি। শিউলী সুমনার অদৃষ্টের জন্য চিন্তিত, দুঃখিত। নব দম্পতি-জীবনের বিরল অবকাশমুহূর্তে সে ছুটে আসে সুমনার কাছে সপ্তাহে অন্ততঃ দুবার। সে জানে সুমনা কোথায় বেরয় না। অন্য কেউ বন্ধুরাও তার কাছে বেশী আসে না, পিসীর ভয়ে। তিনি নাকি আজকালকার বে-চাল মেয়েদের ঢঙ দেখতে পারেন না। তাঁর নালিশ খুব বড় রকমের, শিউলী জেনে ফেলেছে এবং সবগুলোই আধুনিক মেয়েদের সাজসজ্জা-সম্পর্কিত। একটা হ'ল, তাদের কান আছে কি নেই জানা যায় না। ভগবান-দত্ত ইন্দ্রিয় দুটো ফাঁপা চুলের তলায় কোথায় যে আত্মগোপন করে আছে ধরা যায় না। তাদের অস্তিত্ব বোঝা যায় শুধু ঐ ট্যাড়শের মত আধ-হাত লম্বা ঝুলন্ত দুল্ থেকে। এই জন্যে সুমনাকে তিনি বাড়ীতে সাবেক আমলের মাকড়ী পরান। শিউলীকে তেমন তিনি অপছন্দ করেন না—কেন না সে হ'ল বড় ঘরের মেয়ে। মধ্যবিত্ত অধ্যাপকের স্ত্রী হলে কি হয়, তার বড় ভায়ের মামাশ্বশুর হাইকোর্টের জজ। পিসীমার এক দেওর জেলার জজ ছিলেন, কাজেই শিউলীর প্রতি তাঁর সম্ভ্রমবোধ সহজেই কল্পনা করা যেতে পারে।

সুমির জ্বর আজ তিন চার দিন। খবর পেয়েই চলে এসেছে শিউলী দেখা করতে। বেচারী সুমি! একে ত তার শরীর

ভালো থাকে না, তায় অসুখ। শিউলী বসে বসে মাথায় হাত বুলোচ্ছিল।

সন্ধ্যা হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। পিসী পূজোয় বসেছেন। ঘরে এখনো আলো জ্বালা হয়নি। সমস্ত ঘরটা যেন তন্দ্রাচ্ছন্ন—কেমন একটা অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়া চারদিক দূষিত করে তুলেছে। সুমি ঘুমিয়ে পড়েছে ভেবে শিউলী উঠে জানালাগুলোর দু একটা কপাট আস্তে আস্তে খুলে দিয়ে এসে বসল। সুমনা হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলে—"আচ্ছা শিউলী, তুই যে রকম করে আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলি, কোথায় শিখলি বল্ ত? ভারী আরাম হয় কিন্তু! মাথা টেপাস্ বুঝি সুকুমারবাবুকে দিয়ে?"

শিউলী সজোরে প্রতিবাদ করে উঠল—"ধ্যেৎ, ওর ব'য়ে গেছে। আমার ওসব সাহস হয় না ভাই।"

সুমনা সবিস্ময়ে তাকাতে শিউলী বললে—"আর আমি ভালোও বাসি না। পুরুষ মানুষকে দিযে সেবা করানো দূরে থাকুক্, সংসারের বাজে কাজ করাতেও আমি পছন্দ করি না। স্ত্রী আড় হয়ে বিছানায় শুযে থাকবে, আর স্বামী মশারী ফেলবে, কি ছেলেমেয়েকে শোয়াবার বন্দোবস্ত করবে, কিংবা ফরমাস মত বাজারে ছুটবে পঞ্চাশবার—ও আমার অসহ্য। লেখাপড়াই শিখি আর যাই করি, যদ্দিন অধীনে থাকঁবো, তদ্দিন মেনে চলবো। তুচ্ছ কাজের ঝামেলাতে ও-জাতকে টেনে আনতে নেই—বুঝলি সুমি, শিখে নে। আর তা ছাড়া মেয়েমানুষ হয়ে জন্মেছি, ভাই, আমাদের ত দিয়ে করেই

সুখ, অবিশ্যি স্বামী যদি মানুষ হয়। আমার কিন্তু মনে হয়—তা তুই যাই ভাবিস্ না কেন—পুরুষ মানুষ হবে রাশভারা। জবরদস্তি কোরে সে আমার সব কেড়ে নিক্!"

শিউলী সস্নেহে সুমনার মাথায় একটা মৃদু ঝাঁকুনি দিলে। একটা নিঃশ্বাস ফেলে সুমনা পাশ ফিরে শুলো। তারপর আস্তে আস্তে বললে—"কাল রাতে একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছি—শিউলি! শুনবি?"

"বল্ না কি—আমি মরে গেছি, আর তুই কাঁদছিস, নয়, ঠিক্ করে বল্?"

সুমনা শিউলির হাতে চাপ্ দিয়ে বল্লে—"ছিঃ, ওসব বলতে নেই—শোন্ বলছি।"

স্বপ্নটা এত স্পষ্ট দেখেছিলুম, যে এখনো মনে হচ্ছে সত্যি দেখতে পাচ্ছি চোখের সামনে। ছোটো খাটো, খুঁটি নাটি ঘটনা গুলো—একটাও ভুলি নি। দেখলুম আমি যেন একটা চওড়া সিঁড়ি বেয়ে উঠছি—সিঁড়িটার মাঝখানে লাল, আর দু'ধারে সাদা সিমেণ্টের কাজ। উপরে উঠে একটা চাতাল,—খোলা বারান্দা গোছের জায়গায় এসে পড়লুম। কাশীর পুরোনো মন্দির দেখেছিস তু? তারি পাশে এক-কোণে ছাউনি দেওয়া একটা বসবার জায়গা। অনেকটা যেন পশ্চিমের বারদোয়ারী। সেখানে একটা মার্বেল পাথরের বেঞ্চিতে বসে একজন বৃদ্ধ আশ্রম-বাসিনী একখানা তুলট কাগজ দেখছেন আর নাড়ছেন। কাছে এসে দেখি ছবির মত রঙ-করা—বোধ হয় কোষ্ঠীপত্র হবে, খুব চিত্র-বিচিত্র, নক্সা-আঁকা। কিন্তু সন্ন্যাসিনী মা-র দিকে

ভালো করে নজর দেবার সময় বা ইচ্ছা ছিল না। আমার দৃষ্টি পড়েছে তখন বাঁ দিকের একটা দরজার ওপর। কাঠের ওপর পল্‌-তোলা, দু'ধারে দুটো পদ্ম রয়েছে, কিন্তু উলটো করে বসানো। ভারী আশ্চর্য্য লাগল যখন হাত দিয়ে ঠেললুম। কেন না দরজা যতটা ভারী মনে হয়েছিল, ততটা নয়, বরঞ্চ বেশ হাল্‌কা। ফস্‌ করে খুলে গেল, যেন আমার হাতের স্পর্শে খোলবার অপেক্ষাতেই এতক্ষণ ভেজানো ছিল।

ভেতরে ঢুকে দেখি একটা বড় ঘর, কিন্তু ছাদটা নীচু। দেয়ালগুলো সব পাথরের, খুব ঠাণ্ডা। দেয়ালের মাথায় খিলান-করা, তাতে ঘষা কাঁচ-বসানো। সব রঙীন, চৌকো ছাপ-দেওয়া। মনে হলো যেন অতি পরিচিত ঘরের মধ্যে এসেছি—ছেলেবেলায় মিশনরীদের স্কুলে যে ঘরে আমাদের ক্লাশ বসত, অনেকটা সেই রকমের। ঘরটা অন্ধকার লাগছিল, কিন্তু ক্রমশঃ অভ্যাস হয়ে গেল—বেশ নজর চলে। লক্ষ্য করলুম, একটা কোণে দেরাজ-ওয়ালা একটা ছোটো আলমারী রাখা রয়েছে। কিন্তু কি আশ্চর্য্য—এত কাজ-করা যে কি বল্‌ব! পাল্লায়, মাথায়, পায়াতে, আশপাশে চারিদিকে অতি সূক্ষ্ম কারু-কাজ। তুই শুনছিস—শিউলী?"

"হুঁ—তারপর?"

"তোর যে এম্‌ব্রয়ডারীটার জন্যে স্কুলে ফার্ষ্ট প্রাইজ পেয়েছিলি মনে আছে? ঠিক্ সেই এক ডিজাইন্। সে সব ভারী মিহি কাজ। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে হয়। তারপর ইচ্ছে হল দেরাজগুলো

টেনেই দেখি না, কি আছে। খুলে দেখলুম একটা, তার মধ্যে হরেক রকমের প্রজাপতি সাজানো রয়েছে। বেশ যত্ন করে রাখা আছে—পাখাগুলো কাঠের গায়ে পিন্-দিয়ে আটকানো। আমি ত অবাক্! পর পর সবগুলো দেরাজ খুলে ফেললুম। প্রত্যেকটাই প্রজাপতিতে ভর্ত্তি! কত রকমের রঙ! জগতে এমন আশ্চর্য্য রঙিন প্রজাপতি আছে, কখনো জানতুম না—কোনোটা ঘোর রঙ-এর, কোনোটা হাল্‌কা, আবার কোনোটা একরঙা, কোনোটা বা পাঁচমিশেলী, ছিটে-ফোঁটা দেওয়া। হাঁ করে তাকিয়ে দেখতে লাগলুম। এমন সুন্দর—

"কিন্তু কি রকম মন খারাপ হয়ে যায়,—না?" শিউলী মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করলে।

"মন খারাপ? কেন?" সুমনা একটু অবাক্ হয়ে শিউলীর দিকে তাকালো।

"সব প্রাণহীন ব'লে। তোর ফুলগুলো যেমন আঁকা, প্রজাপতিগুলো তেমনি মরা। তায় মাথা-নীচু পাথরের দেওয়াল-দেওয়া ঘর! দেখে প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে না? তার চেয়ে যদি তোর প্রজাপতির দল খোলা আকাশের নীচে আলোয়-ভরা সত্যিকারের ফুল-বাগানে ঘুরে বেড়াত, তা হলে ঐ রঙিন মৃত্যুবাসরের চেয়ে ঢের বেশী ভাল লাগ্‌ত না কি?"

সুমনা তার স্বাভাবিক হাসি হাসলে—ভীরু ও কুণ্ঠিত। বললে—"তুই কি যে অদ্ভুত সব কথা বলিস্—শিউলী! এ সব তো মাত্র স্বপ্ন! এতে আবার ভালো-লাগা, মন্দ-লাগার কি

আছে? যাক্! এখন শোন্, তারপর কি হ'ল। প্রজাপতিগুলো ছেড়ে এবার ঘরের টুকি-টাকি জিনিষ দেখতে লাগলুম। ছোটো ছোটো র‍্যাকে, টি-পয়ে কত রকম জিনিষ সাজানো রয়েছে। কিন্তু হাত দিতে ভরসা হ'ল না। ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ দেখি একটা ছোটো, নীচু দরজা কোণের দিকে রয়েছে। জানালার পাশে বলে এতক্ষণ আমার নজরে আসে নি। হাত দিতেই খুলে গেল, ঢুকে পড়লুম ভেতরে। বেশ মনে আছে দরজাটা এত নীচু যে আমাকেও মাথা হেঁট ক'রে প্রবেশ করতে হয়েছিল। দেখলুম এটা মন্দিরের গর্ভ-গৃহ। ঘরের শেষ প্রান্তে একটা বেদী সাজানো রয়েছে। ঠিক তারি কোলে ফুল-বিছানো একটা রঙিন···কি দেখলুম আন্দাজ করতে পারিস, শিউলী?"

"মরা ময়ূর?"

"দুর! কি ছাই বকিস্! খাট। জান্লি—সেই খাটের ওপর গেরুয়া কাপড়-ঢাকা একজন নবীন সন্ন্যাসী শুয়ে রয়েছে!"

"মাগো! কি সাংঘাতিক!" শিউলী বললে, "একটুও ভয় করল না তোর?"

"কেন ভয় কিসের? মরা মানুষ ত' নয়!"

"ওঃ আমি ভেবেছিলুম—সব মরার দেশ। তা তুই বুঝলি কি করে যে জীবিত?"

"বুঝলুম, এমনি। তা ছাড়া আমার দিকে পিছন ফিরে শুয়েছিল—"

"তা হলে জানলি কি ক'রে, সুমি, যে সন্ন্যাসী যুবাপুরুষ?

"কী যে বাজে প্রশ্ন করিস্, শিউলী, তার ঠিক নেই! আহা, সবই যেন সত্যি! অনুভব করলুম—মানে অনুমান করলুম্—যে বয়স অল্প। স্বপ্নে অনেক কিছু ঠিক ঠিক ধরা যায়,—নয়? যাক্ সে কথা। তারপর সে ঘর থেকে বড় ঘরটায় আবার ফিরে এলুম একটু বাদেই।"

"তোর সেই যুবক ভদ্রলোককে ফেলে—?"

"সন্ন্যাসীকে দেখে ফিরে এলুম। তারপর বড় ঘরটা পেরিয়ে সোজা আবার সেই খোলা বারান্দায় এসে যেই দাঁড়িয়েছি—"

"যেখানে তোর পিসীমা বসেছিলেন?"

"পিসীমা? কি বল্‌ছিস তুই? পিসীমা কোথায়? সেই সন্ন্যাসিনী-মা বল্!"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, তারপর···"

"দেখলুম তিনি তখনও সেই ছাউনির নীচে বেঞ্চিতে বসে আছেন। হঠাৎ ইচ্ছে হ'ল—কাছে গিয়ে দেখি না কেন, তিনি ঐ সব রঙ-করা নক্সা আঁকা কাগজপত্র নিয়ে কি করছেন! এবার কিন্তু কাছে গিয়ে বড় সাংঘাতিক জিনিষ দেখলুম—

"দেখলি তিনি মৃত্যু-পরোয়ানা সই করছেন···?" শিউলী শ্বাসরুদ্ধ করে জিজ্ঞাসা করলে।

"নাঃ, নাঃ,—খালি আমায় বাধা দিচ্ছিস কেন? তোর আজ কি হয়েছে বল্ ত? যত সব উদ্ভট কল্পনা তোর! শুনবি তো শোন্···কাছে গিয়ে হঠাৎ নজরে পড়ল, তাঁর আলখাল্লার নীচে

মাংসবিহীন পায়ের হাড়! চমকে উঠে মুখের দিকে তাকালুম। সেখানেও কঙ্কাল-চেহারা!"

"তুই চেঁচিয়ে জেগে উঠলি ত' ?"

"না—কেন জানি, এসব দেখে আমার একটুও ভয় হ'ল না। বরঞ্চ কেমন যেন আনন্দবোধ হ'ল···"

"আনন্দ হ'ল ? তুই সত্যি বলছিস, সুমি ?" শিউলী চাপা গলায় বললে।

"হ্যাঁ, বেশ আনন্দ হ'ল। মনের ফুর্ত্তিতে কচিখুকীর মত হাততালি দিয়ে বলে উঠতে ইচ্ছে হ'ল—কি মজা! এ সব জিনিষ তা হলে আমার!"

"যুবকটিকে সুদ্ধ নিয়ে···?"

"যুবক সে আবার কে ? ওঃ—সেই সন্ন্যাসী। না—তার কথা আমার মনে ছিল না সে সময়ে। একেবারে ভুলে গিছলুম।"

"তারপর ?" শিউলী জিজ্ঞাসা করলে।

"তারপর আর কি—আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল কিন্তু কি আশ্চর্য্য···?"

"একটা কথা সত্যি বল্‌বি···আমার ভালোবাসার দোহাই—বল্‌বি সুমি—ঠিক্ ?" শিউলী সহসা কেমন উত্তেজিত হয়ে উঠল।

"বল্ না—কি ?"

"সেই যুবকটির কথা তোর মনে রইল না? একেবারে ভুলে গিছলি, ভালো করে ভেবে দেখ্ দিকি?

সুমনা বালিশের ওপর ভর দিয়ে উঠে হেলান দিয়ে বস্‌ল। একটু ভেবে মাথা নেড়ে বললে, "নাঃ—সত্যি মনে ছিল না তার কথা। মানে, সে ঘরে আমি ত' বেশীক্ষণ ছিলুম না কিনা! ঢুকেই তখুনি আবার বেরিয়ে এসেছিলুম। বরং খুব স্পষ্ট মনে আছে সন্ন্যাসিনী-মা, আর মরা রঙিন প্রজাপতি..."

"নাঃ—কোনো আশাই নেই দেখছি"—শিউলী স্বগত বলে উঠল।

"কি বলছিস? কিসের আশা? কিন্তু কি আশ্চর্য্য স্বপ্ন বল্ দিকি, শিউলী?"

"সত্যি, ভারী অদ্ভুত। খু-উ-ব সত্যি..." শিউলী অনেকটা যেন আপন মনেই বললে।

"আহা! স্বপ্ন যেন আবার সত্যি হয়। কিন্তু তোর এত মন খারাপ হয়ে গেল কেন শিউলী? সুকুমারবাবুর আসতে দেরী হচ্ছে বলে?"

কিছু না বলে' শিউলী বিছানা থেকে উঠে ঘরের জানালাগুলো আবার এঁটে বন্ধ করে দিলে।

বৈঠকী

যত গোল বাধায় পানু।

কোনো ঠাট্টা তামাসা হচ্ছে, অথবা সজোরে আড্ডা চলেছে, মাঝখান থেকে কাজের কথা পেড়ে রসভঙ্গ করে ফেলে।

আজ যখন সন্ধ্যায় বৈঠকে সে পৌছালো, তখন মুখে তার পরম তৃপ্তির স্মিত হাসি। এ মাসে সে অনেক কেস্ পেয়েছে, উপরন্তু আজকে একটি বড় রকমের মক্কেল গেঁথেছে। তাই অভাবিত সাফল্যে উৎফুল্ল হয়ে অফিস্ থেকে সোজাই সে এখানে চলে এসেছে। তা ছাড়া স্যুট্ পরলে তাকে যে অসম্ভব ভালো মানায় এবং দীর্ঘ প্রিয়দর্শন আকৃতি আরো সুঠাম মনে হয়, এটা সে জানে। তার রীতিমতো খস্-খসে চুল, তার বাদামী রঙ্-এ চোখ আর এরিষ্টক্রেটিক্ চালচলন ইন্সিওরেন্স-এর কাজে সাজে না। তাকে দেখলে মনে হয়, অত্যন্ত হাই-ব্রাউ সাহিত্যিক, অথবা অধ্যাপক,—ঘোরতর ইন্‌টেলেক্‌চুয়াল, পর-পারের উচ্চ-উপাধিধারী এবং চাকরীতে অরুচিপরায়ণ।

কিন্তু তবু পানুর বোহিমিয়ান্ হতে সাধ যায়, যদিও সে নিতান্তই প্র্যাক্‌টিক্যাল লোক। তাই মধ্যে মধ্যে সে সংসারের আবর্ত্ত কাটিয়ে স্থির একটা শান্তির আশ্রয় খোঁজে। তার পুরানো বন্ধুদের মধ্যে যারা এখনও বিবাহ-গ্রস্ত হয় নি, তারা সন্ধ্যাবেলায়

এই একটি স্থানে সমাগত হয়। ফ্ল্যাট্‌টি পূর্ব্বে দলেরই একজন ভাড়া নিয়েছিল, কিন্তু তার বিলাতযাত্রার পর অবশিষ্ট বন্ধুরা মিলে ভাঙ্গা আসর জোড়া লাগিয়েছে। সেখানে সমাজ থেকে সাহিত্য, নারীপ্রেম থেকে বিশ্বপ্রেম, সহশিক্ষা থেকে যোগদীক্ষা, স্বায়ত্বশাসন থেকে জন্মশাসন আর বিদেশীয় নূতনতম পুস্তকের বুলেটিন্ থেকে স্বদেশীয় সংস্কৃতির ধারা—সব কিছুরই আলোচনা হয় এবং চা ও ধূমপান-সহযোগে অত্যন্ত আবেগ-সহকারেই হয়।

বলছিলাম, পানুকে বোহিমিয়ান সাজে না। কারণ?—আর কিছুই নয়। ঘরেতে স্ত্রী আছেন, যিনি বড়লোকের কন্যা, যার মনস্তুষ্টি তপশ্চরণেরও দুর্লভ, এবং সর্ব্বোপরি যিনি সম্প্রতি সাতঙ্ক সমারোহে একটি পুত্র-সন্তান প্রসব করে ফেলেছেন। যৌবনের প্রথমাবস্থায় পানু অনেক নারী-চিত্ত বিক্ষুব্ধ করলেও এখনও নিরাসক্ত গৃহস্থ হবার তার উপায় নেই। সংসার আর বিবাহ-ধর্ম্ম তাকে সম্পূর্ণ কবলিত করেছে। ধুতি চাদর পরলে বেশ স্পষ্ট নজরে পড়ে যে এই তিরিশেই বেচারীর নধর উদরের আভাস এসে গেছে। আগে পানু গান গাইত চমৎকার,—খাঁটি টপ্পার গলা গানে ভরভর করত। এখন সে সব দানা বেঁধে জড়িয়ে গেছে। গান জিনিষটা পারিবারিক যৌথ কারবারের সম্পত্তি কিনা,—তাই সংযত সুরে স্ত্রীর বান্ধবীদের সামনে এখন সে বাঁধা-নীড়ের সাধা-গান গেয়ে থাকে। সুবিধামত ছন্নছাড়া বন্ধুদের উপদেশও দেয়, আর সুযোগ বুঝে তাদের দায়িত্বহীন জীবনের সমালোচনা করে।

"রাধানাথ, আর এক কাপ" বলে পানু ধপ করে একটা ঈজি-চেয়ারে বসে পড়ল। চারিদিকে দৃষ্টিপাত করে জিজ্ঞাসা করলে, "সুবোধটা এখনো আসে নি ?"

সুধীর বললে, "না, সে কাজে বেরিয়েছে দুপুর বেলায়। এখনও বাড়ী ফেরে নি, শুনলুম। লাইব্রেরীর পেছনে লেগে আছে। চিত্তর সঙ্গে এখন পুরানো সাময়িক পত্রিকার নির্ঘণ্ট তৈরি করছে।"

"আর খগেন ?"

"সাহিত্য-সম্মিলনের সভাপতি খোঁজ করে বেড়াচ্ছে !"

"তবে ত' সবই হবে ! যত সব ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো ! বাস্তবিক আমি বুঝতে পারি না তোদের লক্ষীছাড়া হালচাল। একজন কলেজে ছুটি নিয়ে কলকাতায় এসে টো টো করে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, আর একজন কোর্ট পালিয়ে নাগরিক জীবনের নব জাগরণ আনবার চেষ্টা করছেন, কেউ বা সাহিত্যের উন্নতির জন্যে নতুন ধরণের কাগজ বার করছেন। যত রাবিশ্ জমা হয়েছে এইখানে ! এর চেয়ে অমল ভালো, ঐটেই যা মানুষ। বিয়ে তোরা কেউ করিস নি, কিন্তু অবিবাহিত হয়েও অমলের সংসার-ধর্ম্ম করবার একটা স্বাভাবিক ক্ষমতা আছে। কত রকমের ঝক্কি পোয়াতে হয়, দায়িত্ব নিতে হয়,—তোরা কেউ পারতিস ? পড়াশুনাও করছে, আবার কত কাজও করছে অথচ ফ্যাশন-মাফিক অগোছালো কিংবা অন্যমনস্ক নয়। সংসারী না হ'লে বুঝি সংসারের বাঁধন থাকতে নেই ?"

ঘরে একটা তিরস্কার, আহ্বান, দোষারোপ, সমর্থনের ঢেউ ব'য়ে গেল। কোরাস্ নীচু পর্দ্দায় একটু নাম্‌লে গুণী অমলের কাছে একটা সিগারেট চাইলে। বললে—"গলা শুকিয়ে গেছে। বাপ্‌স্, দেববাবুর পাল্লায় পড়েছিলাম। জ্যেষ্ঠতাতের বন্ধু পূজনীয় ব্যক্তি—কিছুই বলা যায় না। ভদ্রলোকের দাঁত-টাঁত সব পড়ে গিয়েছে, কথা বোঝাই মুস্কিল। অবশেষে যা মর্ম্মোদ্ধার করলুম, তা এই। ছোট ছেলে ব্যবসায়ে নেমেছে, অনুমান করছি টাইপ্‌রাইটারের। কেননা অনেকক্ষণ ধরে' রয়েল, করোনা, রেমিংটনের সূক্ষ্ম পার্থক্য প্রমাণ করছিলেন—আমার স্কন্ধে চাপাবার আশায়। বেগতিক দেখে বললাম, বাড়ীতে কলেরা-কেস। দেববাবু আর একদফা অসুখের প্রকার-ভেদ সম্বন্ধে বক্তৃতা দিলেন। সেখান থেকে ছাড়া পেলাম ত' ইন্দু পাকড়াও করলে। ছিলো দোকানে বসে,—বললে, গুণী, একটা ভালো জিনিষ অর্ডার দিয়ে আনিয়েছি। ফোল্ডিং বুক-র‍্যাক্। ভারী টেঁকসই। আসল সাহারানপুরী কাঠের কাজ, আইভরি-সেট। সাইজ্ বাইশ-বাই-দশ। অত্যন্ত মজবুত।' আপত্তি করবার অবসর পেলুম না। সভয়ে জিজ্ঞাসা করলুম—'দামটা?' বললে—'বেশী নয়। পরে পে কোরো। এখন বেয়ারা দিয়ে বাসায় পাঠিয়ে দিচ্ছি। ভাবলুম্ এত ডীসেণ্ট, তোমার জন্যই রেখে দিই। মোটে নাইন্ ফিফ্‌টীন্, সারপ্রাইজিংলি চীপ্।' কই সিগারেট দিলিনা, অমল। না, তুই বুঝি আবার দান-

খয়রাৎ ভালো বাসিস নে। আর দে একটা, ক্যাশ পেমেণ্ট হাতে হাতে করছি।”

অমল সিগারেট দিতে গুণী বললে— “প্লেয়ার্স? এই নে দু’পয়সা।”

অমল হাসিমুখে সেটা পকেটস্থ করলে। তারপর নীচু হয়ে হাত বাড়িয়ে রুমালটা কুড়িয়ে গুণীকে ফেরৎ দিলে, আব সেই সঙ্গে দশ টাকার নোটটাও।

পানু বললে—“সিলি, চাইলডিশ! এইবার নিয়ে ক’বার টাকা হারিয়েছিস, গুণী?”

সবাই জানে, প্রশ্নের উত্তব কেউ আশা করে না সেই কারণে।

গুণী হ’ল একটা—একটা ক্যাবেকট্যর। মূর্ত্তিমান্ বিশৃঙ্খলা। জীবনে ন’টা কলম খারাপ করেছে, এগারটা পার্স হারিয়েছে আর তেবোটা ছাতির হদিস পায় নি। ডান্ পকেটে থাকে একটা ছোট তোয়ালে মুখ মোছার জন্য, আর এক টুক্‌রা কার্ব্বলিক সাবান। রাস্তাঘাটে চারিদিকেই বিষাক্ত জীবাণু কিনা। বাঁ পকেটে থাকে নোট, খুচরো টাকা-পয়সা সিগারেট ও গোটা তিন চার খালি দেশলাইয়ের বাক্স। বুক পকেটে উঁচু হয়ে থাকে রুমাল ও একরাশ কাগজ, দরকারী ও অদরকারী। গায়ে সর্ব্বদাই একটা এণ্ডির চাদর জড়ানো আছে, কবে সেটা আর পাওয়া যাবে না তার স্থিরতা নেই। পরনে লম্বাঝুলের পাঞ্জাবী, যার শেষের বোতামটি কেবল টিকে আছে এবং কোণ-

গুলো জিনিষের ভারে ঝুলছে। ধুতির কোঁচাটা মাটিতে লোটায় আর কাছার খুঁটটা তেরছা-ভাবে বিলম্বিত থাকে। সব চেয়ে অপ্রয়োজনীয় জিনিষের বেলায় আর আশ্চর্য্য রকমের প্রখর স্মৃতি-শক্তি, আর যেটা সব চেয়ে জরুরী, সে সম্বন্ধে সম্পূর্ণ বিস্মরণ। বুদ্ধির অস্বাভাবিক দীপ্তি আছে, কিন্তু সাংসারিক সমস্যায় প্রয়োগ-শক্তির অভাব। মতির দৃঢ়তা নেই। অটুট বন্ধুপ্রীতি কিন্তু বাহ্য প্রকাশে অক্ষম। উপদেশ বা পরামর্শ নেওয়া চাই, অথচ সামান্যতম সমালোচনায় রাগটুকুন ষোল আনা। কাল্পনিক ব্যাধি অনেক—ডিস্‌পেপ্‌সিয়া থেকে স্পাইনাল্ টি বি; কিন্তু শ্রেষ্ঠ ও আসল ব্যাধি হ'ল চক্ষুলজ্জা।

তবু গুণী না হলে চলে না। তার অনুপস্থিতিতে আসর ফাঁকা, চায়ের আড্ডা অচল, সাহিত্যের মজলিস্ প্রাণহীন।

বৈঠক পুরা দমে চলেছে, কেবল অনিত্য এখনো হাজির হয়নি। রাধানাথ ধূমায়িত চায়ের পেয়ালা নিয়ে আসবার সঙ্গে সঙ্গেই অনিত্যর আবির্ভাব। হাতে ব্রাউন পেপারের দুটি মোড়ক। কাড়াকাড়ি করে একটি খোলা হল। তাতে গরম সিঙ্গাড়া। অপরটী গুণী খুলে দেখে বললে—"এঃ, চলবে না।"

"কেন, কি হয়েছে ?"

"আন্‌লি ত নরম আন্‌লেই হত।"

"এও ভালো, একবার ট্রাই করেই—"

"নাঃ, কড়া পাকের সন্দেশ। একে ত হাতুড়ের হাতে দাঁত দুটি বিসর্জ্জন দিয়েছি, তার ওপর এই জিনিষ মুখে দিলেই বাকী

কয়টির মায়া ত্যাগ করতে হবে। এখনো ফুলে রয়েছে, ব্যথাও মরেনি। ভেতরটা আড়ষ্ট, জিব্ লাগলেই শিউরে উঠতে হয়।"

গুণী গালে হাত বুলোতে লাগল।

সুশীল বলে উঠল—"কিছু হবে না। এক পাশে চিবুতে থাক্। ব্যথার রাজত্ব এখন, স্বয়ং ব্যথাহারী ভগবান্।"

হৈ চৈ করে' চা-সহযোগে খাবারগুলোর রীতিমত সদ্ব্যবহার হ'ল।

পানুর কথা বলার অবকাশ ছিল না, তবু তারি ফাঁকে মন্তব্য করলে, "ভাষায় কুলোচ্ছে না,—পেটের মধ্যে রেগুলার বয়লার—অফিসে যা খাটিয়েছে—"

অমল সযত্নে রুমাল দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে বললে,—"দিশী খাবারের কাছে কিছু কি লাগে ?"

সুশীল শান্ত জবাব দিলে—"পেটে রায়ট থামলেই পেটিয়ট হয়।"

গুণী সিগারেট ধরিয়ে অনিত্যকে বললে, "এই অনিত্য সংসারে তোর হাত জুটোই যা' নিত্য।"

অমল গুণীর কাছে একটা সিগারেট চাইতেই কেস্‌টা বেরিয়ে এল। তাতে হরেক রকমের জিনিষ—ভার্জিনিয়া থেকে টার্কিশ, সব একাকার। রাশ্যান প্রতিনিধিও বর্ত্তমান। গুণী ধূমপানের গুণী, খাঁটী চেন্-স্মোকার, আবার সব জিনিষেই বৈচিত্র্যের পক্ষপাতী।

পানু ঈজিচেয়ারে হেলান্ দিয়ে প্রসন্ন মেজাজে বললে—

"ত্থাখ একটা কথা আমি ভাবি। লোকে বন্ধুবান্ধবের কাছেই সব চেয়ে আগে সাহায্য পায়, যখন ব্যবসায় নামে। কিন্তু তোরা আজ পর্য্যন্ত একটা কেস্ দিলি না।"

গুণী বললে "এখুনি দিচ্চি। তিন বছর ধরে প্রীমিয়াম দিচ্ছি আর পারা যায় না। তুই আমার হয়ে—"

"ইয়ারকি রাখ! একটা বিয়ে-থাও করলিনি কেউ যে বড় রকমের দাঁও মারবো।"

"বিয়ে যদি হয়, এমন কি পাবো যাতে তোর উদরপূর্ত্তি হবে?"

অবিবাহিত যুবকদের আখড়ায় বিবাহ-সংবাদটা হামেশাই উঠে থাকে। যেহেতু এখানে সবাই স্থিরলক্ষ্য কুমারের দল, বিয়ের কথাটা সেই কারণে আলোচনা হয় বেশী মাত্রায়, কখনো প্রসঙ্গতঃ, কখনো অকারণে। অসম্ভব ও অকল্পনীয় ব্যাপারেই মানুষের আসক্তিটা অধিক। সে সম্বন্ধে আলাপ করেও একটা অবচেতন বাসনা চরিতার্থ হয়।

কোণের দিকে বীরু এতক্ষণ চুপটি করে বসেছিল। অমলকে প্রশ্ন করলে, "হ্যাঁ রে, সেই রায়পুরের মেয়েটির কী হোল? তার কি বিয়ে হয়ে গেছে?"

"কি জানি, ঠিক্ বলতে পারি না। তবে অনেক দিন অপেক্ষা করে বসেছিলেন তাঁরা, এ কথা শুনেছি। আমার সম্পূর্ণ অনিচ্ছা জানানো সত্ত্বেও। কিন্তু আমি কি করতে পারি? কন্যাপক্ষেরা বলেন, আপনারা আজকালকার ছেলে, আপনারা

না বুঝলে কি করি বলুন? আপনারা এই রকম গোঁ ধরে বসে থাকলে মেয়েদের বিয়ে হয় কি করে? তাদের ভবিষ্যৎটাও দেখতে হবে ত? আমি মনে মনে ভাবি, তাঁরাও কুমারী থাকুন। সৃষ্টি উঠে যাবে? যাক্, ক্ষতি নেই। বিধাতার এমন কিছু অপূর্ব্ব কেরামতি নয় যে পৃথিবীটা উচ্ছন্ন গেলে একটা মস্ত কিছু লোকসান হবে! তা ছাড়া কেউ ত আর পরের অবস্থা দেখতে আসব না। কিন্তু এ শুধু আমার কথা নয়! পঁচিশ থেকে পঁয়ত্রিশের মধ্যে অধিকাংশ কর্ম্মহীন যুবকেরই এই অবস্থা। যারা কাজ পেয়ে যায়, তারা ঠুন্‌কো প্রতিজ্ঞা ভাঙ্গে। বদ্যি, বারেন্দ্র এ বিষয়ে ভালো। তারা মেয়েও ভালো পায়, আবার অদৃষ্টে শ্বশুরগৃহের সাহায্যও জোটে। একতা আছে কিনা, ছোটো থাক্ বলে'। কিন্তু রাঢ় দেশের বামুন-কায়েতের অবস্থা শোচনীয়, কি মেয়ের, কি ছেলের। কে কাকে দেখে?"

"ও সব সমাজতত্ত্বের কথা থাক। কিন্তু তুই ত গান ভালবাসিস, অমল। মেয়েটীর গলা অপূর্ব্ব, তোর কাকার মতো সঙ্গীতজ্ঞ লোক এ কথা অকপটে আমাদের কাছে স্বীকার করেছেন। সেটা কি কম হলো? কল্পনা করে গ্যাখ, তুই ঘুম থেকে উঠে বাগানে পাইচারী করছিস একদা বসন্ত প্রভাতে। সহসা বিশুদ্ধ জৌনপুরী আলাপ-রত তোর স্ত্রী এসে চাপা উজ্জ্বল হাসিতে তোর কাপড়ের খুঁটে অজস্র বেলফুল বেঁধে দিলেন বিশ্বাস করবি না বললে—কিন্তু এই গ্যাখ হাত দিয়ে বলতে বলতেই গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠেছে।"

"কল্পনায় মালঞ্চ ত পেলুম, কিন্তু মালিনী রাখার সঙ্গতি ?" মক্কেলবিহীন উকীল বিজয় বললে, "সঙ্গীত যতই উচ্চাঙ্গের হোক, তার শ্রুতি যতই মধুর হোক, আমার একটু জ্বালাও আছে। মনে করো, বেনামদার অথবা হানাফী উত্তরাধিকারের সমস্যা-কণ্টকিত নথিপত্র নিয়ে আমি যখন গলদ্ঘর্ম্ম হয়ে উঠেছি, পাশের কামরায় স্ত্রীর সান্ধ্য আসরে ঠন-ন্-ন্ করে তবলার ঘা পড়ল। অথচ সেটাও আইনত ন্যায্য। গাইয়ে মেয়ে যখন ঘরে এনেছি, তখন গৃহলক্ষ্মীর সঙ্গীতচর্চ্চার সুযোগ করে দিতে আমি বাধ্য। সখের কাজল পরে অশেষ দুর্গতি আর কি ?"

পানু প্রশ্ন করলে, "কিন্তু কৃষ্ণনগরের মেয়েটা কি দোষ করলে ? সত্যি অমল, এমন ভালো মেয়ে আর পেতিস্ না। যেমনি মিষ্টি চেহারা, তেমনি নরম স্বভাব। এই এতটুকু বয়স থেকে দেখছি তাকে, ভারি ব্রাইট মেয়ে। ক্লাশে একটানা ফাষ্ট, অবিশ্যি ইংরাজী ছাড়া ! তোদের বৌদি আবার বরাবরই ইংরিজীটাতে…"

খগেন মন্তব্য করলে, "সবই ভালো বুঝলুম ! কিন্তু অমল ত কোনো দিন পাত্রী নিয়ে ভালো-মন্দ বিচার করতে চায় নি ! বারে বারে বিয়ের কথা নিয়ে ওকে খুঁচিয়ে লাভ ? ও ত সোজা শেষ কথা বলে দিয়েছে সবাইকে। তার চেয়ে গুণীকে…"

মুখের কথা লুফে নিলে, "রাজসাহীতে আমার এক মামাতো বোনের মেয়ে আছে। নামটী কলি, বয়স ষোল, জ্ঞানে ষাট। ভূমিষ্ঠ হয়েই সে পাকা কথা বলে; আর এ বছর,

ম্যাট্রিক দেবার পর থেকে সকলকেই সমান ভাবে। যে কোনো কুড়ি থেকে পঁচিশ বছরের যুবককে সে করুণার চোখে দেখে থাকে। কুড়ির নীচে যাদের বয়স, তাদের ওপর তার মাতৃভাব। কাল তার চিঠি পেয়েছি, আমাদের এই বিয়ে না করে' দায়িত্বহীন জীবন কাটানকে সে সমালোচনা করেছে, প্রথম যৌবনের শাণিত ও অসহিষ্ণু ভাষায়। পরিশেষে লিখেছে, তার কে এক বেলাদি'র কথা, কি জানি কোন স্কুলের টীচার। মাত্র পনর দিন আলাপ হয়েছে, কিন্তু ভাব জমেছে অত্যন্ত গাঢ় রকমের। তার বিয়ের জন্য আমার ভাগ্নীটি ব্যস্ত হয়ে উঠেছে, ভালো পাত্রের সন্ধান দিতে অনুরোধ করেছে। যদি অনুমতি হয় ত গুণীর কথা লিখে দিই।"

সুশীল নিরীহভাবে বললে, "গুণী তরশু বলছিল—বিয়ে করলে মন্দ হয় না। তিন দিন ত হয়ে গেছে, এখনো তার সদিচ্ছা টিঁকে থাকবার কথা নয়!"

গুণী গম্ভীর হয়ে বীরুকে জিজ্ঞাসা করলে—"সব্‌জেক্‌টস?"

"ম্যাট্রিকে হিষ্ট্রি, হাইজিন। আই-এস্‌-সিতে অঙ্ক, ফিজিক্‌স, কেমিষ্ট্রি। বটানি ফোর্থ সবজেক্‌ট। বি-এস্‌-সিতে এনথ-পলজি, জুলজি, এক্‌সপেরিমেণ্টাল সাইকলজি।"

সুশীল—"বাকী রইল শুধু বায়োলজি আর চাইল্‌ড ট্রেনিং।"

সুবোধ মন্তব্য করলে, "পোষ্ট গ্রাজুয়েটে এইবার একটা হাস্‌বেণ্ড ট্রেনিং ডিপার্টমেণ্ট খুললে হয়। শুধু টীচার্স ট্রেনিং-এ কি হবে?"

"না, হাসির কথা নয়। ব্যাপারটা এই, যে কোনো কারণেই হোক্, কারুর আর বিয়েতে উৎসাহ নেই। কাপুরুষতা বল আর কুঁড়েমিই বল, ওতে যেন বিতৃষ্ণা এসে গেছে। পঁচিশের নীচে যখন বয়স ছিল, অভিভাবকেরা কাঁধে জোয়াল চাপিয়ে দিলে যে কোন উপায়েই হোক্ জুড়ি আপনি চল্‌ত। কিন্তু এখন আর হয় না। খানিকটা দেখে শেখা, খানিকটা নিজস্ব অভিজ্ঞতা হয়েছে। অর্থের মোহ পেয়ে বসেছে, এখন কি আর ছেলে মানুষী করা সাজে?"

সুধীর বললে—"অথচ বিয়ের সম্বন্ধ এলে সব বুড়ো আই-বুড়োর দলও খুসী হয়ে উঠে। বরং না খোঁজ খবর এলে, মনে হয় পৌরুষে কোথায় আঘাত লাগল।"

অমল ভরসা করে বলে ফেল্‌লে, "খাঁটি কথা। আমারও এক এক সময়ে বিয়ের ইচ্ছে হয়, কেন না বৌয়ের চেয়ে ফুল ঢের ভালবাসি। তারপর ধর আলোই আর উৎসব, আর একজনকে উপলক্ষ্য করে' এক ঝাঁক অপরিচিতা তরুণীর উচ্ছল কলহাসি,—সব মিলিয়ে বেশ ভালোই লাগে! যদি তোরা একদিন আমায় সাজিয়ে গুজিয়ে সুসজ্জিত গাড়ীতে করে' গরমের দিনে রাত ন'টার সময় ময়দানে ঘুরিয়ে একলা ফিরিয়ে নিয়ে আসিস্, তা হলে 'ক্যাসানোভা'য় সকলকে—"

তোর যে দেখছি আসলের চেয়ে নকলে বেশী রুচি।"

"হ্যা, রোমান্সের চেয়ে রোমান্টিক্ সেটিংটাই এখন ভালো লাগে।"

অনিত্য—"কিন্তু তাই ব'লে রসিকের মত খাতাপত্তর তৈরী করে মেয়ে পরীক্ষা ক'রে বেড়ানো শুধু অন্যায় নয়, শাস্তির যোগ্য! বিয়ে করবার মন নেই, অথচ দপ্তরীর কাছ থেকে এক লেজার বানিয়ে এনেছে। তাতে যথারীতি ঘর টেনে ভাগ করা আছে। হাইট্, সাইজ্, কমপ্লেক্শুন্, চুল, গড়ন, পড়াশুনা, গান বাজনা, জেনারেল ইম্প্রেশুন এবং অবশেষে টোটাল। সাতচল্লিশটী মেয়ে দেখার পর যখন মত জিজ্ঞাসা করা গেল, কোন্টী পছন্দসই, তখন শোনা গেল 'কেন, সে ত ঠিকই আছে! চপিকে বিয়ে করব।' কে তিনি? 'সে আমার কল্পনা-রাজ্যে বাস করে। মেঘের মত চুল ছড়িয়ে সর্ব্বদা শুয়ে থাকে। ড্রাই প্লুরিসি। সন্দেহজনক রোগটা স্থির নির্ণয় হলেই একদা গোধূলি লগ্নে মালাবদল হবে। বাপের পটারী না এনামেল ওয়ার্ক্স্ আছে। ঐ এক মেয়ে।' ওকে সকলের সামনে ধ'রে অপমান করা উচিত।"

অমল—"সে পাষণ্ডের তুলনায় আমরা ত ঋষি। আমরা কন্যাপক্ষকে সোজা বুঝিয়ে দিই। নাছোড়বান্দা হলে অন্য পাত্রের সন্ধান দিই। বলি, ঝুলিয়ে রাখা ভালোবাসিনে। অন্যত্র চেষ্টা দেখুন। তাতেও কৃতকার্য্য না হলে বলি আঠারো থেকে একুশের মধ্যে বারবার তিনবার হাঁপানী হয়েছিল। নেহাৎ রোজগার করে খেতে হয়, নইলে কাল্পনিক নৈতিক স্খলনের কথাও উল্লেখ করতুম।"

সুশীল—"আচ্ছা বীরু, তোর ভাগ্নীর বেলাদিদার কথা খুলে

বল দিকি শুনি। গুণী না করে, আমিই না হয় একবার অনেষ্ট অ্যাটেম্প্‌ট্‌…”

বীরু—“বললুম ত একটু আগেই। ঘুমোচ্ছিলি তখন?”

সুশীল—“একটু রঙ্‌ চড়িয়ে শোনাও দাদা। অত শব্‌ছা আব্‌ছা বল্‌লে ছবি ক্লিয়ার হয় না।”

গুণী—“ও হোপ্‌লেস ইডিয়টের কাজ নয়। কল্পনার দরকার। শোন্‌ তবে…

বিনয় আর বেলা। পোষ্ট গ্রাজুয়েট আর স্কটিশ্‌। দাদার সহপাঠী নিশ্চয়ই। আলাপের সূত্রপাত হল বেশ সহজ ভাবেই। যখন মনোভাব পরস্পরের কাছে পরিস্ফুট হ’ল, তখন,…তখন কি হ’ল অমল?”

অমল—“বিনয় ব্যাক্‌ করলে। পেপার মার্চ্চেণ্টের কন্যাকে বিয়ে ক’রে শ্বশুরের টাকায় সাগর-পাড়ি। সেখানে বছর চারেক তা-না-না-না ক’রে ফেরবার পথে হাম্‌বুর্গ থেকে ‘পাঁচকড়ি দে,—হিজ মাইণ্ড এণ্ড আর্ট’-এর ওপর থীসিস্‌ দিয়ে…”

গুণী—“অথবা প্যারী থেকে রাসলীলা—এ মডার্ণিষ্ট্‌স্‌ পয়েণ্ট অব্‌ ভীয়ু—”

অমল—“একই কথা। ডক্টরেট্‌ নিয়ে কলকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন। অতঃপর অধ্যাপনার চেষ্টায় অকৃতকার্য্য হয়ে পোর্সিলেন অথবা লৌহখণ্ডের বাণিজ্য-সম্ভাবনা নিয়ে মেতেচে।”

গুণী— তাই বেলা বি-এস্‌-সি পাশ করে কলকাতা ছাড়ল। মালদা সদরে এলোকেশী গার্লস্‌ স্কুলে শিক্ষয়িত্রী হয়ে এক নিস্তব্ধ

নিশীথে আবিষ্কার করলে, যে কেমিষ্ট্রির ফর্মূলা দিয়ে জীবনটাকে উড়িয়ে দেওয়া যায় বটে কিন্তু এই স্বার্থপরতার যুগে আত্মত্যাগের [illegible]কে বুঝবে! শঠের সঙ্গে শঠতাই উচিত ব্যবহার। গ্রীষ্মের [illegible] তাই পিস্‌তুতো দাদার বাড়ী বেড়াতে গিয়ে ষোলো বছরের কলির কাছে নিরুদ্ধ মন ও দেহের কুণ্ঠিত প্রকাশ।"

অনিত্য—"কিন্তু আশ্চর্য্য লাগছে। পঁচিশ বছরের মেয়ে···"

"বাই নো মীন্‌স্।" গুণী বললে। "ত্রিশের একচুল কম নয়।"

"আচ্ছা তোর একটা দুর্ব্বলতা আমি বরাবর লক্ষ্য করেছি গুণী। বয়স বেশী না হলে কোনো মহিলাকে তোর ভালো লাগে না, কেন বল্‌ত?"

"অতি সহজ কথা। কারণ আমাদের যুগের মেয়ে না হলে আমি কথা বলে সুখ পাই না।"

অমল বললে, "তা নয়। আসলে তুই একটা কচি খোকা। মেয়েদের কাছ থেকে দিদির মত স্নেহ-যত্ন পেতে তুই সদাই ব্যগ্র। কাজেই তোর টেষ্ট হয়েছে ঐ মেট্রনের মত স্থির, গম্ভীর..."

"স্যর্টেন্‌লি। জীবনে পোড় খেয়েছে, আঘাত পেয়েছে, এমন নারীই আমি পছন্দ করি। স্কুল গার্ল নিয়ে বিব্রত হতে চাই না। উগ্রযৌবনা মেয়েদেরও আমি সযত্নে এড়িয়ে যাই। আমি পছন্দ করি ঐ সব রীজ্‌নেবল মহিলা। তাদের চাহিদা খুব কম হয়, দাবী বেশী থাকে না,—হারাবার ভয় আছে কি না! চেহারা হবে ছিপছিপে, তবে কাঠের সখী নয়। চোখে মিনতি, মুখে

বিষাদের স্পর্শ। লোকে বলবে ম্যাডলিন, আমি কেবল নিভৃতে জান্‌বো সে স্থালোমে।”

সুবোধ—“তা ছাড়া একটা মস্ত সুবিধেও আছে। আমাদের সামর্থ্যের দৌড় ত জানা আছে। বড় জোর যত্নর দোকানি থেকে কিমাম-দেওয়া পান, নয়ত দুর্গার ডিস্‌পেন্‌সারী থেকে একটা টনিক, তাও ধারের কারবারে। কাজেই এই দুর্ম্মূল্যের বাজারে, ও-রকম উপার্জ্জনশীল মেয়ে ত একটা সলিড সাপোর্ট। রোজগার করে খাওয়াতে পারবে।”

গুণী—“রাইট্, কিন্তু নিরিমিষ। দাঁতের অবস্থাটা বয়সের সঙ্গে সঙ্গেই আরো খারাপ হচ্ছে। সুতরাং ধোঁকা, অথবা মোচার ঘণ্ট...”

খগেন খাটের উপর উঠে বসে সঙ্কুচিতভাবে বললে, “কিংবা সরু চালের পায়েস···”

অমল—“তা হলে বিধবা-বিবাহ-সহায়ক সমিতিকে একবার স্মরণ করলেই হয়—”

গুণী—“করতুম। কিন্তু আতঙ্ক আছে। মনে হয় যদি আমাকেও সাবাড় করে। করুক্, তাতে ক্ষতি নেই। কিন্তু দুর্ম্মতিবশে যদি ভালবেসে ফেলি, মরে গিয়েও শান্তি পাবো না। সূক্ষ্মশরীরে সর্ব্বদাই চিন্তা চলবে যে আমার কচি বিধবাটি আমার মনে যে আগুন জ্বালিয়েছিল, আমার অবর্ত্তমানে তৃতীয়তমের চিত্তে যদি সেই উত্তেজনার স্পর্শ লাগে···”

সুধীর—"তোর কল্পন রাবহর দেখে বলিহারী যাই, কিন্তু যাই বল্—পার্ভার্টেড..."

সুবোধ জিজ্ঞাসা করলে—"বিয়ে তোকে করতে হবে না অমল। তোকে ফুলমালায় সাজিয়ে ইচ্ছামত একদিন ময়দানে ঘুরিয়ে নিয়ে আসবো'খন এমনি। কিন্তু তোর ধারণাটা একবার বল্ শুনি।"

অমল—"আর বুড়ো বয়সে লজ্জা দিস্ কেন? তা ছাড়া অল্প কথায় বলা মুস্কিল। কি কি চাই নিজেই জানি না। বিয়ে ব্যাপারটা এতই নিজস্ব ব্যাপাব, কাল্পনিক ছবিটাও বাইরে প্রকাশ করতে সঙ্কোচ লাগে।"

বীরু—"আহা! নব বধূটি যেন। আচ্ছা অনাগতার কথা ছেড়ে কি রকম শ্বশুরবাড়ী পছন্দ বল্ দিকি।"

অমল—"শ্বশুরবাড়ী হবে বিদেশে, যেখানে চেঞ্জে যাওয়া যায়। তবে বেশী লোকজন ভালোবাসিনে।

সুশীল—"মানে?"

অমল—"ঠাকুমা অথবা মামা-জাতীয় ব্যক্তি না থাকলেই ভালো হয়।"

বীরু—"ঠাকুমা না হয় আদরে নাতনীকে মাটী করতে পারে, কিন্তু মামা কি করলে?

অমল—'তোমার অতি আদরের কলি ভাগ্নীটির সঙ্গে মনে করো বীরভূমের এক জুনিয়র উকিলের বিয়ে হ'ল।' তারপর

আধুনিকতায় ফেল-করা স্বামীকে মামার আদর্শে যদি যাচাই করতে বসে, তা হলে ভদ্রলোকটির অবস্থা কল্পনা করে দেখো। শিক্ষা দেবার সময় বাপের বাড়ীতে লোকের অভাব হয় না। দাদা পরীক্ষার জন্যে মাষ্টার জুটিয়ে দিচ্ছেন, মামা সঙ্গীতের তালিম দিচ্ছেন, কিন্তু বিয়ের বেলায় সেই অন্ধকারে ঢিল ছোঁড়া। প্রতিকূল আবহাওয়ায় কী মারাত্মক ফল বল্ দেখি। তারপর বাবা থাকুন আপত্তি নেই, কিন্তু ফর্ হেভেন্স সেক্, যেন মা-ও থাকেন।"

খগেন—"সব পুত্রবধূরই শ্বশুরের ওপর বেশী শ্রদ্ধা ভালোবাসা, আর সব জামাই-এরই শাশুড়ীর ওপর বেশী টান্।"

অনিত্য—"কারণও আছে অবিশ্যি—শাশুড়ীর যত্নটা…"

অমল—"রট্‌ন্! সেবা-যত্নের কথা হচ্ছে না। যে মেয়ে অল্প বয়সে মাকে হারিয়েছে, সে প্রায়ই নিষ্ঠুর হয়। তা' ছাড়া শাশুড়ী থাক্‌লে মেয়ে স্বামীর ঘর করতে ভালো ভাবে শেখে। নইলে বৃদ্ধ, বিপত্নীক পিতার উপদেশগুলো তেমন কার্য্যকরী হয়না। আর একটা কথা, শ্বশুরের কাছে জামাইয়ের নালিশ জমে না! শাশুড়ীকে সালিশী মানা যায়। সহানুভূতি মেলে অন্ততঃ।"

সাহিত্যিক সুধীর যোগদান করলে—"কিন্তু মা থাক্‌লেও বাপের প্রভাব অনেকস্থলে বেশী হয়ে থাকে, এমন দেখা গিয়েছে। এবং সেটি একবার বদ্ধমূল হলেই, বলি 'ইংল্যাণ্ড, মাই ইংল্যাণ্ড', পড়েছিস তো?"

অমল—"ওসব লরেন্স-টরেন্স রাখ্। সাহিত্যের কথা এখানে

হচ্ছেনা। অবিশ্যি হতে পারে সবই। বাপ হীরো হলে স্বামী ভিলেন্ হবার আশঙ্কা আছে। তারপর ধর্ ভাইয়ের কথা। ক্যাজিনের দল না থাকাই বাঞ্ছনীয়। আর দাদা যদি থাকেন—"

সুধীর—"কেন, দাদা বেচারা কি দোষ করলে?"

অমল—"বেশী কিছু না। আদর্শবাদী দাদার হাতে ভাবপ্রবণ বোনের শিক্ষা উঁচুদরের হয় বটে কিন্তু রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস আর সংসার ত এক বস্তু নয়। বিপ্রদাদাকে শ্রদ্ধা করি কিন্তু কুমুকে রাখি কোথায়? মধুসূদন না হলেও অনেক বিচক্ষণ স্বামীই তাকে নিয়ে বিব্রত হবে।"

খগেন—"বুঝলুম। কিন্তু মেয়েটির ডেফিনিশ্যন্ ত হোল না।"

সুধীর—"আমি ভালোবাসি ঝালের ঝোল। মেয়ে হবে তেজী অথচ কোমল।"

অমল—"ও সব বজ্রাদপি কঠোর অথচ কুসুমের মতো মৃদু মেয়েদের কথা রেখে দে। উপন্যাসের সাধারণ নায়িকা আমার কাছে অ-সাধারণই ঠেকে। সারা প্রাণ ঢেলে দিয়ে তুষ্ট করতে চেষ্টা করলুম, তবু তাঁর দৃপ্ত মহিমা নত হল না।"

গুণী কথা জুগিয়ে দিলে—"অথবা নিজেকে তুচ্ছ করে স্ত্রীকে বাঁচিয়ে তুললুম। ভালো হয়ে আমায় খুব কৃতজ্ঞতা জানালেন, বুকে মাথা রেখে কত হিষ্টেরিকল্ কান্না কাঁদলেন। তারপর সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যখন দেহে সামর্থ্য এলো, নিজে হাতে তিনি নানাবিধ অন্নব্যঞ্জন রেঁধে খাওয়ালেন,—সন্নি, পাখার বাতাস করে রাত্রে ঘুম পাড়ালেন। সকালে উঠে দেখি, পুরাণো চাকর

কাত্তিক এসে বলছে, 'ভোর বেলায় মাঠা'ন এই চিঠিখান নিকে রেখে গেছেন বাবু! আপনার চায়ের জল ফোটাতে বলে গেছেন। তৈরী হয়েছে, আনব কি?' খুলে দেখি চিঠিখানা,— শেষে লেখা আছে:

'কিন্তু আর না। এইবার উঠি। কৈফিয়ৎ দিতে গেলেই বেড়ে যায়। পোড়া মন শাসন মানে না যে। পারো ত ক্ষমা করবার চেষ্টা করো কিন্তু ভুল বুঝে না। মনে রেখো যে ভালোবাসা সংসারের তুচ্ছ দান প্রতিদানের ঊর্দ্ধে, তা' স্বার্থপর নয়। আত্মপরীক্ষার জন্য সে অতি নিকটের সামগ্রীকেও দূরে সরিয়ে দেয়। কার্ত্তিকের কাছে চাবি রইলো, একটু সমঝে চলো। তুমি আবার যে অগোছালো মানুষ, দূরে থেকেও আমার দুশ্চিন্তার অবধি থাকবে না। পথের সাথী করেছি যাকে, তাকে তুমি ভালো করেই চেনো। কিন্তু সে উপলক্ষ্য মাত্র। অন্তর্য্যামীকে সাক্ষী করে বলতে পারি, আমি আজো নিজের কাছে অপাপবিদ্ধ। তবু যাচ্ছি কেন? প্রশ্ন করতে পারো বটে। কি জানি, অন্তরের সত্যকে মানুষ কতটুকু চিনতে পারে! তবু জোর গলায় কিছু বলবার অধিকার বোধ করি নিজেই হারালুম। শুধু এইটুকু মিনতি, অতি বড় দুর্দ্দিনে অভাগীকে যেন স্মরণ কোরো। ইতি—'

হাউ বুড্যু ফীল্?"

অনিত্য—"তা হলে চাইছ যে, নন্দনকাননের একটী নাম-

গোত্রহীনা মেয়ে বিয়ের রাতে নিষ্কলুষ যূঁইফুলের মত তোমাব বুকের ওপর ঝরে পড়ুক ?"

অমল—"চাইনে কিছু। গল্প চেয়েছিলে শুনতে, তাই খানিক বানিয়ে ব'লে মনে ব্যথা দিলুম্।"

বিজয় বললে—"আসলে তুই বুর্জ্জোয়া। যদি যুগধর্ম্ম মেনে চল্‌তিস…"

অমল—"সুখী হতুম্। কিন্তু সইবেনা ভাই। এসব বিষয়ে আমি ব্যাক্ নাম্বার। সব চেয়ে ভালো, গুণীর মতানুযায়ী একটি সুঈট্ গোছের শিক্ষয়িত্রী।"

পানু এতক্ষণ চুপ করে শুনছিল। এইবার ঈজিচেয়ার থেকে গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে বসল। বললে, "আচ্ছা, তোরা কি কাজের উপযুক্ত বলতে পারিস ? কেন আমাদের এই অবনতি হচ্ছে, কেউ ভেবে দেখিছিস ? যত সব কাপুরুষ ! অবিবাহিত লোকেব অস্বাস্থ্যকর কল্পনাবিলাসটাকে তোরা সার করেছিস। কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাস করি বাস্তব জীবনের সঙ্গে মুখোমুখি পরিচয়ের সাহস তোদের আছে কি ? জীবনটা বে-পরোয়াভাবে কাটানোই জীনিয়াসের চিহ্ন নয়।"

খগেন বললে—"এই রে ! আবার সীরিয়াস কথা পেড়ে বসল !"

গুণী—"আমরা যে কত অপদার্থ তা ভালো করেই জানি, প্রভু। ভাষ্যের প্রয়োজন নেই। শুধু বিয়ে নয়, যে কোনো

কাজে—যাতে অধ্যবসায়ের দরকার তাতেই আমরা অকর্ম্মণ্য। লজ্জায় মনে হয় এক সঙ্গে গলায় দড়ি দিই!"

অমল—"কিন্তু সে প্রলোভন সাম্‌লে নিই এই ভেবে, যে কোনো-না-কোনো দিন শ্রীভগবানের কৃপায় নিষ্ফল জীবন্ সফল হতে পারে। আমার ধারণা যে আমাদের এই কাপুরুষতা ও অপদার্থতা হয়ত বায়োলজির কোন অজ্ঞাত…"

"থাক্, বিজ্ঞানের কথাটা তোলা থাক্।"

গুণী—"কিংবা গ্রহের ফেরে—"

পানু—"বায়োলজি অথবা অ্যাষ্ট্রলজি,—কোনোটারই দোহাই পাড়িস্‌নে। যদি কিছুর মধ্যে পড়িস্ ত জ্যুলজি। কেবল বাক্যের আড়ম্বরে নিরুদ্দেশ জীবনের সমর্থন করবার চেষ্টা। বিয়ে হবে না ছাই হবে! এদিকে আইডিয়াল্ ওয়াইফ্ খুঁজে মরছে সব! তোদের কিচ্ছু হবে না—যদি কিছু হয়তো মিড-ওয়াইফ্।"

অনিত্য সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাতে গুণী সমস্যা-পূরণ করে দিলো—"আই এগ্রী। মিসট্রেস আর ওয়াইফের মাঝামাঝি যদি পাওয়া যায়, মন্দ কি?"

হাসির হুল্লোড়ে সেদিনকার মত সভা ভঙ্গ হ'ল।

চাকর

এত বিষয় আছে ভাববার, কিন্তু সকল কাজ আর চিন্তা তলিয়ে গেছে এক মহাচিন্তায়। আজ চারদিন হ'ল চাকর চলে গেছে এবং এই চারদিন ধরে ক্রমাগত চাকর খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়েছি।

বালিগঞ্জে এসে স্বামী-স্ত্রীতে ছোট একটি নীড় বেধেছিলাম, ভেবেছিলাম, উভয়ের জীবনে একটা নিরবচ্ছিন্ন শান্তির স্রোত প্রবাহিত হতে থাকবে, আর আমি আমার পড়াশুনা নিয়ে দিনগুলো নিশ্চিন্ত আরামে কাটিয়ে দেব। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত আমার নিরালা আর সুকুমার সাহিত্যচর্চ্চা যে এরকম নিষ্ঠুর আঘাত পাবে, তা কখনও কল্পনা করতে পারি নি। যে গৃহিণী তাঁর অখণ্ড অবসরটাই আমার সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধানের পিছনে নিযুক্ত করে থাকেন, এমনকি, এই সাত দিন আগে তাঁর মধ্যবয়সী স্বামীর অবাঞ্ছিত জন্মতিথি উপলক্ষে একটা সুন্দর উপহার কিনে বাজে খরচের জন্যে মন খারাপ করেন নি, তিনিও শেষকালে কঠিনস্বরে জানিয়ে দিয়েছেন—"আজ সন্ধ্যার মধ্যে চাকর ধরে না আনতে পারলে আমাকে অগত্যা অক্রুর দত্তের লেনে যেতে হবে।"

বলা বাহুল্য, ঐ বৈষ্ণবজনোচিত নিরীহ গলিতেই তাঁর পিতৃগৃহ। আমি একবার বিনীত সুরে বলেছিলাম যে, গত

চারদিন ধরে আমি ত নিয়তই চেষ্টা করেছি, কেবল 'আনন্দবাজারে' নিরুদ্দেশ-কলমে বিজ্ঞাপনটাই দেওয়া হয় নি। নতুবা যে কোন সুস্থমস্তিষ্ক, শিক্ষিত ভদ্রলোকের পক্ষে স্ত্রীর কষ্ট লাঘবের জন্যে যা কিছু করণীয় সবই করেছি। গৃহিণী আরও কঠিন হয়ে বললেন, "সারাদিন ধরে কর কি এমন যে একটা চাকরও খুঁজে আনতে পার না ?"

একবার ইচ্ছা হ'ল বলি—"তোমারই-বা এমনকি বিশ্ব-পালনের দায়িত্ব! বাজার করে আর রাঁধে বামুনে; ঠিকা ঝিতে বাসন মাজে। ছোটখাট কাজ বাহালের জন্যে সশরীরে আমি নিজেই বর্ত্তমান। ঘরে ছেলেপুলেও নেই যে তার জন্যে হাঙ্গামা পোয়াতে হবে। সুতরাং চাকর আনতে যদি একটু দেরিই হয়, তাতে মাথায় বজ্রাঘাত পড়বার মত এমন কি হয়েছে ?"

কিন্তু এগুলো হ'ল নেপথ্যে স্বগতোক্তি। মুখে বললাম—"সাত আট টাকার কমে কেউ থাকতে রাজী নয় যে! তুমি ত ছ'টাকার বেশী দেবে না।"

"কেন দেব শুনি ? লোক ত মাত্র দুটি! কাজই বা এমন কি, যে রোজগারের সমস্ত টাকা চাকরের শ্রীপাদপদ্মে ধরে দিতে হবে ? বালিগঞ্জের রেটই খারাপ—যেমন জায়গা, তেমনি থাকার সুখ! শ্যামবাজার ছিল ভাল।" গৃহিণী রাগে গজ গজ করতে লাগলেন।

কথাটা কিছু পরিমাণে সত্যি। যতটা শোনা যায়, ততটা নয়। মধ্যবিত্ত লোক একটু আলো-বাতাসের লোভে এ-পাড়ায়

আসে বটে, কিন্তু স্রেফ্‌ সার্ভেণ্ট-প্রব্লেম শেষ পর্য্যন্ত তিষ্ঠুতে দেয় না। কলকাতায় চাকরের সমস্যা এত মারাত্মক নয়, মাইনেটাও কাজের অনুপাতে সরকারী পেন্‌সনের মত মোটা অঙ্কের নয়। আর এখানে নিত্যই ঝি-চাকরের সন্ধানে ঘুরে বেড়াও। বালিগঞ্জ হ'ল ভৃত্য-শ্রেণীর ট্রেনিং-গ্রাউণ্ড্‌। দু'দিন থেকে কাজ শিখতে না শিখতেই মিথ্যা অজুহাতে উধাও। আর সাত আট দিন পরে এসে আবার দু'দিনের মাইনে দাবি! আশ্চর্য্য—যতো শয়তানের আড্ডা!

আজ রবিবার। ভেবেছিলাম, দুপুরে খেয়েদেয়ে কোথায় একটু "বিউটি স্লিপ্‌" হবে, তা না এই রোদে চাকরের সন্ধানে পরিচিত, অর্দ্ধপরিচিত আর অপরিচিত লোকের সুপারিশ করে বেড়াও।

সত্যি, এ ব্যবস্থা অত্যন্ত আপত্তিকর। চাকর চলে গেলে পুরুষকেই বা সমস্ত কাজ ছেড়ে চাকর জোগাড় করতে হবে কেন? এই ত সেদিন অজিত বলছিল যে, তার স্ত্রীর জন্যে কোন চাকর টিঁকে থাকতে পারে না, নিত্যই পলায়ন আর সন্ধানের পালা চলেছে। কোন গৃহিণীর ভাঁড়ার-চুরি সম্বন্ধে বৈধ অথবা অবৈধ সন্দেহ, কেউ-বা খাটিয়ে নিতে চান, এক ঘণ্টাও বিশ্রাম অথবা আলস্যের প্রশ্রয় দিতে চান না। আর কেউবা সহবৎ-শিক্ষা প্রভৃতি খুঁটিনাটি নিয়ে মাথা ঘামান। এবার থেকে নিয়ম করা উচিত যে, বাপেরবাড়ি থেকে চাকর সাপ্লাই করা হবে।

একটু তন্দ্রা এসেছিল, কিন্তু ধড়মড়িয়ে উঠে বসলাম। গৃহিণীর তীব্র হুকুমে আর মুখ-ভারে আমাদের এই ছোট্ট বাড়িটি থম্‌থমে হয়েছিল,—যেমন জার্ম্মানির হুমকিতে গোড়ারদিকে মধ্য ইউরোপের সঙ্কটাপন্ন পরিস্থিতি। ভাবলাম—যাই, অজিতের বাসায় গিয়ে ওর ঠাকুরের শরণাপন্ন হওয়া যাক। ওখানে অনেক মেদিনীপুর, বালেশ্বর জেলার ভিড়, একটা যা হয় ধরে নিয়ে আসা যাবে। যদি অজিতের স্ত্রী ইতিমধ্যে তাকে তাড়িয়ে না দিয়ে থাকে, তাহলে চাই কি আজ সন্ধ্যের মধ্যে একটা কিছু বন্দোবস্ত হ'বে বলে আশা করা যায়।

রাম চাকরটা সত্যিই ছিল ভাল। পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন ও সচ্চরিত্র। নেশার মধ্যে এক বিড়ি, তাও আড়ালে খেত, বাসা নোংরা করত না। হপ্তায় দু'বার সাবান-কাচা কাপড় ও ফরসা বেনিয়ান পরত, টেরিটাও উগ্র ছিল না। চালাক, চতুর, চটপটে। বাজার করত ভাল। দামে বা ওজনে জিনিস মারত না; বলত, "বাবু, দস্তুরী ত পাই, আর বেশী লোভ করা ভাল নয়।" রাত্রে এত ভাল গা-টিপত যে, ঘুম এসে যেত পনের মিনিটের মধ্যেই। তবুও গৃহিণী সামান্য একটু ভুলের জন্য দিলেন তাকে বরখাস্ত করে।

আমি যদি একটু সাবধান করে দিতাম আগে থেকে, তাহলে এমনটি হতনা। আমারই এক-আধ সময়ে এখনও গোলমাল হ'য়ে

যায়; তখন রাম অসাবধানতায় যে এ ভুল ক'রে বসবে, তার বিচিত্র কি ?

এখানে একটা কথা বলে রাখি যে, মোটামুটি আমার গৃহিণী লোক ভাল। মিতব্যয়ী হ'লেও কৃপণ নন; মেজাজ মাঝারি, অন্তত অকারণে খিট্ খিট্ করেন না। আধুনিকা হয়েও তিনি সংসারকে সিনেমার মত ভালবাসেন, ছোটখাট সাংসারিক ব্যাপারে আর চাকরী, অর্থোপার্জ্জন প্রভৃতি বড় বড় ব্যাপারেও তাঁর আশ্চর্য্য মেধা আর অন্তদৃষ্টি। তবে হ্যাঁ, গোটাকয়েক দুর্ব্বলতা তাঁর আছে। অন্ততঃ একটা ত আছেই। সেটা হ'ল তাঁর সঞ্চয়-প্রবৃত্তি। মানে, ফাউ-এর ওপর তাঁর অনুরাগ আছে, আসক্তি বললেও চলে।

ভাঁড়ারের কোনে তাঁর একটা ডিপার্টমেণ্ট স্টোর্স আছে। সেখানে দরকারী-অদরকারী নানা জিনিস তাঁর খাস তত্ত্বাবধানে বিরাজ করে। ছেঁড়া কাপড়েব পুঁটুলি, পুরানো খাতা ও খবরের কাগজের ক্রমবর্দ্ধমান বাণ্ডিল, এবং সিগারেট টিনের সারবন্দী থাক্,—এ তিনটে জিনিসের ওপর তাঁর অসীম মমতা। ঠিক পতি-ভক্তির কারণে নয়, ওগুলোর সাহায্যে নাকি অনেক দরকারী জিনিস পাওয়া ও কেনা যায়। সেই কারণেই তিনি ওগুলো যত্ন ক'রে তুলে রাখেন।

আগে আগে আমায় উপদেশ দিতেন। বলতেন, "প্লেয়ার্স, ক্যাভাণ্ডার সিগারেট কিনো। ওদের সঙ্গে কুপন থাকে, তা দিয়ে অনেক জিনিস পাওয়া যায়।" পরে দেখলাম যে, নেশা

ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে। সিগারেট থেকে চা, চা থেকে দিশী বুজরুকি তেল আর ঔষধে কুপন-নেশা সংক্রামিত হচ্ছে। তা'তে অবশ্য আমার আপত্তিকর কারণ ছিল না,—যেহেতু ব্যবহৃত জিনিসের বিনিময়ে যদি ফাউ কিছু আসে, মন্দ কি? কিন্তু দুপুর রোদে যদি কোন ভদ্রসন্তানকে লিপটন, অথবা প্লেয়ার্সের কুপন নিয়ে অফিস অঞ্চলে রিডেম্পশন্-মার্টে ঘুরে বেড়াতে হয়, তাহলে নিশ্চয়ই আপত্তির ঘোরতর কারণ আছে। তারপর ধরুন—পুরানো কাগজ। জমানো মন্দ নয়, আজকাল কাগজের আবার যে রকম চাহিদা! কিন্তু ঐ সব কাগজেই আবার 'শব্দ-বন্ধনী' প্রতিযোগিতা আছে। গৃহিণী সেগুলো পড়েন, টাকা পাঠান, আর আমায় সমস্যা পূরণের জন্যে উত্যক্ত করেন। তার-পর ছেঁড়া কাপড়ের সাহায্যেও নিত্য-ব্যবহার্য্য বাসন ইত্যাদি পাওয়া যায়। কিন্তু মুস্কিল এই যে, আমার জামা-কাপড় ছ'মাসেও ছেঁড়ে না। গৃহিণী অনুযোগ করেন, "বউবাজারে আমদের বড়দি'র কপাল ভাল। নলিনীবাবুর ফি মাসেই কেমন কোট-প্যান্ট, ধুতি-পাঞ্জাবী ছেঁড়ে।"

আমি কয়েকবার পেরেক ও আঙুলের সাহায্য নিয়েছিলাম, তা'তেও গৃহিণী সন্তুষ্ট নন। কাজ বাড়ে, রিপু করতে হয়। যাতে আর ব্যবহার না করা যায়, এমনভাবে জামা-কাপড় ছেঁড়ার আর্ট আয়ত্ত করতে আজও পারি নি। সিগারেট সম্বন্ধে আমার জেদ্ কিন্তু ছাড়ি নি। গৃহিণীকে বুঝিয়েছিলাম, যে সব সিগারেটে কুপন বা প্রিমিয়মের প্রথা আছে সে সব অখাদ্য

তিনি বললেন, "কেন অজিতবাবু, বিভূতিবাবু সবাই ত খান!"

বললাম—"ঐ সব কুপনের দাম ধরে নেয় না, কোম্পানি থেকে? তুমি যে ভাব কুপন মুফতে দেয়, তা নয়। বিলিতি জোচ্চুরি তুমি বোঝ না। তাছাড়া, এখন যদি সিগারেট বদ্‌লাই, অনেক দিনের অভ্যাসের ফলে ফট্ করে একটা গলার রোগ হবে।" কাজেই সিগারেট নিয়ে আর কিছু বলেন না।

কিন্তু কাল হ'ল ঐ ছোড়া কাপড়ের বস্তা আর পুরানো কাগজের বাণ্ডিল নিয়ে। রাম দু'দুবার বারণ সত্ত্বেও সেগুলো ঝেঁটিয়ে সাফ করেছে। প্রথমে আমাকে একচোট নিলেন, বললেন, "বাবুর আস্কারাতেই চাকরের আস্পর্দ্ধা বৃদ্ধি হয়।"

আমি প্রতিবাদ করেছিলাম, "ডাস্টবিনে ফেলে দিয়ে আসতে আমি বলি নি। তবে ঘরদোর পরিষ্কার করতে বলেছিলাম, আর সে কথা তুমিও ত বল।"

তা'তে কাজ হয় নি। রামের অন্ন গেল। আর আমাকেও সেই সঙ্গে চাকর শিকারের নূতন কাজ নিতে হ'ল।

আজ চারদিন ধরে অনেক চেষ্টা করেছি, কিন্তু সফল হই নি। রাত্রে ঘুম ভাল হচ্ছে না। গৃহিণীকে একটু-আধটু বাড়তি কাজ করতে হচ্ছে, ঘরে ঢুকেই তিনি হয় জান্‌লা-দরজাগুলো জোরে ধাক্কা মেরে বন্ধ করেন, অথবা খোলেন। চাবিটাও অকারণে সশব্দে মাটিতে ফেলেন। আমার আবার বদ্‌অভ্যাস যে, খাবার পরে যে সুখতন্দ্রাটি আসে, তার আমেজ একবার চটে গেলে আর ঘুম

আসতে চায় না। উঠি আর বসি, জল খাই, পান চিবুই, সিগারেট ধরাই। খুট-খাট শব্দ হয়, গৃহিণী বিরক্ত হয়ে বলেন, "সারাদিন হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পর দু'দণ্ড যে নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমব, তার জো নেই।" বিড় বিড় করে বলি, "বেশী ঘুমুলে লিভার খারাপ হ'য়ে যাবে।"

জামাটা গায়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। গৃহিণী একবার বললেন, "বেলের সরবৎটা খেয়ে গেলে হ'ত না?"

বললাম—"যে ঘোল খেতে যাচ্ছি, বেলের জায়গা হবে না।"

মোহন ভ্রূবিভঙ্গে হাসি চেপে জিজ্ঞাসা করলেন, "নতুন তাত পড়েছে, ছাতাটা নিয়ো।"

গম্ভীর হয়ে উত্তর দিলাম—"ওটা আমার বিয়ের ছাতা, দু'বার হারিয়েও পেয়েছি। তিনবারের বার হারিয়ে যদি আবার ফিরে পাই, তাহলে নেভিল্ চেম্বারলেন হ'য়ে যাব। তখন তোমার চাকর খুঁজবে কে?" প্রত্যুত্তরের প্রতীক্ষা না করেই পিছলে গেলাম।

অজিতের চাকর মহেশ হ'ল অল্-সাউথ-ক্যালকাটা উড়িয়া য়ুনিয়নের সেক্রেটারী। স্থানীয় প্রতিপত্তি তার অসীম, এমনকি, অজিতের স্ত্রীও তাকে সমীহ ক'রে চলেন। এক মাসের ওপর হয়ে গেল, তবু তিনি মহেশকে বিদায় করেন নি। তার হাতে বিস্তর লোক।

অজিতের বাড়ি যাওয়া মাত্রেই অজিত হাসিমুখে আমায় অভ্যর্থনা ক'রে বললে, "সেটেল্ড্! গোপালকে সিলেক্ট করেছি।

অত্যন্ত ক্লেভার বয়। বিশ্বাসী—চোর-ছ্যাঁচোড় নয়। সব চেনে, তার এমন অনেক খবর রাখে যা তুই জানিস না। বৌদি খুব প্লীজ্‌ড হবে।”

মনের সুখে ছ’টা পর্য্যন্ত আড্ডা দিলাম। অজস্র সিগারেট অনেক পেয়ালা চা এবং অফুরন্ত গল্প ক’রে উস্কো-খুস্কো চুল নিয়ে ঠিক সাড়ে ছ’টায় গৃহিণীর আল্‌টিমেটম্‌-মাফিক সময়ে স-ভৃত্য হাজিরা দিলাম।

পরের দিন সকালে দেখলাম গোপাল ছেলেমানুষ বলেই হোক্‌ অথবা পাঁচ টাকা মাইনে চেয়েছে বলেই হোক, গৃহিণীর সুনজরে পড়ে গেছে। চমৎকার ছেলেটা—চেহারাটা ভদ্র-ঘরের মতই, বেশ চালাক-চতুর। দু’বার এক কথা বলতে হয় না। বাজার-টাজার করে ভাল, সব জিনিসের দর জানে।

কিন্তু যে কারণে গৃহিণী তাকে সুনজরে দেখলেন তার কারণ আলাদা। গোপাল সঞ্চয়ী ছেলে। প্রথম দিন থেকে ঐ একটি গুণেই সে মা’র হৃদয় জয় করেছে। আজ এক মাস হ’ল আমার বাড়িতে কাজে লেগেছে। প্রায় প্রতি সপ্তাহেই দু’তিন টাকা করে সে আমার স্ত্রীর কাছে গচ্ছিত রাখে। জিজ্ঞাসা করলে বলে—“চুরির পয়সা নয় বাবু! আমার কিছু কিছু টাকা ধার দেওয়া আছে। হপ্তার শেষে সুদে-আসলে যা পাই, মার কাছে জমা রাখি।” এ ছাড়া, সে দুটি নতুন দোকান আবিষ্কার করেছে, যেখানে ঘি ও তেল কিনলে মাসের

শেষে নাকি একটি করে কাঁচের 'জার' উপহার দেওয়া হয়, আর নিয়মিত চা কিনলে পাউণ্ড পিছু তিনখানা ক'রে কুপন দেয়। এ রকম দেড়শ' কুপনে চায়ের সেট্, আড়াইশ'তে প্রাইমাস স্টোভ।

ব্যস্। আমার স্ত্রী মনের সুখে আছেন। আমিও অনেকটা নিশ্চিন্ত আছি। গোপালের দৌলতে আমায় আজকাল কোন হাঙ্গামাই পোয়াতে হয় না। মধ্যে মধ্যে ছেলেটাকে এক-আধটা পয়সা দিই। সে সব জমিয়ে তার মা'র কাছে রেখে দেয়। সে নাকি বলেছে, পয়সা জমিয়ে জমিয়ে দক্ষিণ অঞ্চলে বাগান-জমি কিনবে, ব্যবসা করবে নারকোলের—অনেক লাভ। আমার স্ত্রী তাকে উৎসাহ দেন। আমার কাছে কিন্তু সে অন্য কথা বলে।

"পয়সার দরকার অনেক রকমের বাবু। আমাদের দেশে আবার মেয়ের বাপকে টাকা দিতে হয় কি না···"

একটু চমকে উঠে বললাম—"তুই বিয়ে করেছিস নাকি ?"

"না এখনও হয়নি। তবে···" সলজ্জ সঙ্কোচে মনিবের কাছে সে মাথা হেঁট করলে।

"তবে কি ?"

"গিরিবালার বাপ কড়া লোক। মেয়ে সোন্দর কি না—তাই দুশো টাকা চায়, নইলে একশোতেই কাজ হ'য়ে যায়···"

বিস্মিত হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলাম—"তোদের দেশের মেয়ে ত ? তা' বয়েস কত ?"

"আজ্ঞে এগারো। তবে বাড়ন্ত কি না⋯"

"তোর এরি মধ্যে কি বিয়ের বয়েস হয়েছে?"

"বাবু, আপনাদের মত দেরি বয়েসে বিয়ে করা আমাদের দেশে রেওয়াজ নেই। তা' মেঘে মেঘে বেলা হয়েছে বাবু,—উনিশ-কুড়ি বছর হ'ল বৈকি⋯"

"দেখলে ত মনে হয় না।"

"আজ্ঞে না। মেদিনীপুরে আমাদের গাঁয়ের দিকটা বড় ম্যালেরিয়া। ছেলেবেলায় আবার সান্নিপাতিক-বিকার হয়েছিল কি না, তাই বাড় কমে গেছে।"

বললাম, "হুঁ! কলকাতায় এলে চাম্‌চিকেরও চেহারা বদ্‌লায়।"

সেদিন সন্ধ্যায় অজিত, বিভূতি আর আমি লেকে গিছলাম। গল্পে গল্পে অনেক রাত হ'য়ে গেল। ফিরব ফিরব ভাবছি এমন সময়ে শুধু-গায়ে অল্পবয়সী একটি ছেলে এসে হাত পেতে বললে—"একটি পয়সা দিন্—বাবু।"

যেখানে আমরা বসেছিলাম, সেদিকটা অন্ধকার। আবছা আলোয় ছেলেটির শীর্ণ মুখ দেখে মায়া হ'ল। ভাবলাম, এই বেকার সমস্যার আলোচনা ক'রে এতক্ষণে হাতে হাতে তার নমুনা পেলাম। বিভূতি তাকে অনেক প্রশ্ন করলে। জানা গেল, ঘরে বিধবা মা, পিসী, দুটি অবিবাহিতা বোন, আর একটি নাবালক ভাই আছে। এতগুলি পোষ্য, সমস্ত দায়িত্ব তার একার। ব্রাহ্মণের ছেলে, পৈতে দেখালে। কিন্তু লেখাপড়া

তেমন শেখেনি, তাই চাকরী মেলে না। অজিত বললে, "বামুনের কাজ কর না কেন ?"

"দিন্ না বাবু করে—আমি ত অনেক খুঁজেছি। একটু দয়া করে গরীব ভিখিরীর উপকার করবেন...?"

ঠিকানা দিয়ে অজিত বললে,—"কাল সকালে আমার বাড়ি যেয়ো।"

ছেলেটি রাজী হ'ল। তারপর যাবার সময়ে আমার দিকে তাকিয়ে ভাঙ্গা গলায় বললে, "দয়া হবে না বাবু ? একটি পয়সা দিন্—সারাদিন খাওয়া হয় নি..."

মনটা ভিজে ছিল, তাড়াতাড়ি পকেটে হাত দিয়ে একটা আনি বার করলাম। ছেলেটি এগিয়ে আসতেই তার মুখে একখানা চলন্ত মোটরের হেড্‌লাইট পড়ল। বিস্মিত হ'য়ে দেখি—গোপাল !

রাত্রে বাড়ি এসে শুনলাম, স্ত্রী বলছেন, "এত রাত হয়ে গেল, গোপাল এখনও এল না ! ছোঁড়া গাড়ি-ঘোড়া চাপা প'ড়ল না ত ?"

গম্ভীর গলায় জিজ্ঞাসা করলাম, "সে কি রোজই বেরোয় নাকি ?"

গৃহিণী আমতা আমতা করে বললেন—"হ্যাঁ, তা রোজই একরকম বৈকি। সন্ধ্যে থেকে ছটফট করে ; বলে মা রেড়িও শুনতে যাই। ফুটবল খেলা আর যুদ্ধের খবরে ওর ভয়ানক ঝোঁক কি না। আর তুমি ত ফেরো সেই রাত ন'টায়। তাই

ঘণ্টা দুই ওকে ছুটি দিই। কিন্তু এত রাত তো সে কোনদিন করে না—”

বিছানায় শুয়ে ভাবলাম—গোপাল আর এসেছে! এবার দেশে চিঠি লিখে একটা পাড়াগেঁয়ে ভূত আনাবো, নইলে কলকাতার চাকর নিয়ে আর চলবে না, কিন্তু ইতিমধ্যে…?—কাল থেকে আবার চাকর খোঁজা সুরু।

পরের দিন সকাল বেলায় প্রাতর্ভ্রমণ সেরে বাড়ি ঢুকছি, এমন সময়ে দেখি গোপাল থলি হাতে বাজারে বেরুচ্ছে। আমাকে দেখে একবার থতমত খেয়ে দাঁড়াল, তারপর হঠাৎ পা দুটো জড়িয়ে কেঁদে ফেললে। বললে, “দোহাই বাবু! মা'কে বলবেন না। আর কখনও হবে না এমন কাজ। কি করব বাবু,—বোশেখ মাস এসে গেল মোটে দেড়শ' জমেছে… এই ক'টা টাকার জন্যে…”

তৃষ্ণা

জয়ন্ত মহা মুস্কিলে পড়েছে তৃষ্ণাকে নিয়ে।

কবে যে সে মুস্কিল আসান হবে তার কিছুই স্থিরতা নেই। অন্ততঃ বর্ত্তমান অবস্থায় তাদের বিবাহিত জীবন যে সোজা অথচ বাঁকা পথে চলেছে এবং মনে হয়, চলতে থাকবে তা'তে বিশেষ

কোনো আশার কথা শোনা যাচ্ছে না। একমাত্র অদৃষ্টের ওপরই নির্ভর করছে সমস্ত ব্যাপারটা। এবং সেই অদৃষ্টের চক্রে যদি জীবনের মোড় ঘুরে যায় আর তৃষ্ণা যদি সহজ ও সুস্থ হয় তবেই জয়ন্তের মুখে হাসি ফুটবে।

যে মানুষ অশান্তির বিভীষিকায় যৌথ পরিবারের নিশ্চিন্ত আরামটুকু ছেড়ে অর্থের অভাব না থাকা সত্ত্বেও কলকাতার বাইরে চাকরি নিয়েছে এবং মফঃস্বলের অনেক ছোটখাটো অসুবিধা ভোগ করছে, সে মানুষের এই সামান্য শান্তির জন্যে কাঙালপণা দেখলে মনে হয়—নির্ব্বিরোধ জীবনযাত্রা জয়ন্তের পক্ষে বুঝি এক আশাতিরিক্ত সৌভাগ্য।

অথচ বলতে কি, এমনটি হ'বার কথা নয়। জয়ন্ত নির্ব্বোধ নয়। লেখাপড়া শিখেছে, দায়িত্বপূর্ণ কাজে বাহাল আছে। মেজাজ তার ঠাণ্ডা, অল্পেই সন্তুষ্ট হতে সে জানে। বুদ্ধিমান, বিশেষ ক'রে স্থিরবুদ্ধি বলে, বাজারে তার সুনাম আছে। তৃষ্ণাকে সে দেখে-শুনে, চিনে ও জেনে ঘরের গৃহিণী করেছিল। চোখ কান বুজে আন্দাজে ঢিল ছোঁড়ার ছেলে জয়ন্ত নয়। বিয়ের আগে সে বন্ধু-বান্ধবের কাছে অকপটচিত্তে সগৌরবে বলে বেড়িয়েছে, তৃষ্ণার মতন মেয়েই সে খুঁজছিল। এতদিন ঠিক্ ধাঁচের মেয়ে মেলেনি বলেই সে বিয়ে করবেনা বলে স্থির করে রেখেছিল। তাই যখন নিতান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে আত্মীয়ের বাড়ি বেড়াতে গিয়ে সে সুদূর পশ্চিমে এই রত্নটি আবিষ্কার করে তাকে পরমাত্মীয় করবার জন্যে উঠে-পড়ে লেগে গেল,

তখন এ ব্যাপারে ঈশ্বরের মধ্যস্থতার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত আছে এ ধারণা তার বদ্ধমূল হ'ল। এই মনোমত নবতর জীবনযাত্রায় ভাগ্যনিয়ন্ত্রণের জন্যে বিধাতার কাছে জয়ন্ত অত্যন্ত কৃতজ্ঞ একথা অঙ্গীকার করতে তার কোনো কুণ্ঠাই ছিল না। কিন্তু বিধাতা বোধ হয় অত বাঁধাবাধি ভক্তি-কৃতজ্ঞতার ভিতরে থাকতে নারাজ।

প্রথমে তৃষ্ণা যখন স্বামীগৃহে এল, তখন গোলমালের কোন চিহ্ন ছিল না। বরঞ্চ নবদম্পতির সুমধুর জীবন আত্মীয়-স্বজন অনেকের কাছেই ঈর্ষ্যার সামগ্রী ছিল। বড় জায়েরা বলতেন, অবিশ্যি গোপনে—'নতুন বৌ বলে কি সমস্তক্ষণ স্বামীর মুখে মুখ রেখে বসে থাকতে হয়? আমাদেরও ভাই এককালে সবি হয়েছিল, কিন্তু এত বেলা-করে-ওঠা কখনো...”

বিধবা ননদ কিন্তু সকলের সামনেই আপনার মতামত ব্যক্ত করতেন, “পটের বিবিটি সেজে বসে থাকলে ত আর সংসার চলে না। আর স্বামীর সঙ্গে দিনরাত আদিখ্যেতার ফুসুর ফুসুর করলে পেট ভরবে না। গতর চাই। এই রোগা দু'খান হাড় নিয়ে আমাদের হেন কাজ নেই করতে হয় নি। নতুন শ্বশুরবাড়ি গিয়ে কখনো একদণ্ড সেই মানুষের সঙ্গে আড়ালে কথা বলার সুযোগ পাইনি—সাহসও হয় নি। শ্বশুর-শাশুড়ীর মতে সংসার চল্‌ত, আমাদের উঠতে-বসতে হত। কিন্তু এখন...” বলেই নিরাভরণ শীর্ণ হাত দু'খানি উলটোতেন।

বন্ধুরা বলত জয়ন্তকে—“বেশ আছিস যা হোক্। ঘরে

সুন্দরী স্ত্রী তার ওপর পয়সা। ক'সে প্রেম করে যাচ্ছিস্।" প্রতিবেশীরা সুসজ্জিত দম্পতির হাসিমুখ দেখে মন্তব্য করত—"যা হোক্, মানিয়েছে বেশ। দেখলে চেয়ে থাকতে ইচ্ছে করে—যেন রয়াল পেয়ার।"

বিবাহিত জীবনের প্রাথমিক সুখসন্তোষ তখনও ফুরোয় নি। জয়ন্ত ও তৃষ্ণার মুখে যে লাবণ্যের ছাপ থেকে যায়, তা খাঁটি। চোখে তাদের রঙীন্ আবেশ—দেখলে মনে হয়, যেন কোন্ অপরূপ স্বপ্নসমৃদ্ধ জগতে তারা বিচরণ করে। জীবন বয়ে যায় লঘূর্ম্মি নদীর একটানা স্রোতের মত। এতোটুকু ঝড়-তুফান নেই, অশান্তির ছোঁয়াচ নেই। আছে শুধু পরস্পরের নির্ভরশীল অচ্ছেদ্য বন্ধনের অনুকূল হাওয়া আর নিবিড় আকর্ষণের মন্থর স্পন্দন।

মধুচ্ছন্দ দিনগুলি কাটছিল ভালোই। কাল হ'ল সেবার বাপেরবাড়ি যাওয়া। ফিরে এসে তৃষ্ণা যেন অন্য মানুষ হয়ে গেল। অল্প কথাতেই সে আজকাল চট্ করে চটে ওঠে, সামান্য কারণে উত্তেজিত হয়ে কেঁদে ফেলে। জয়ন্ত তৃষ্ণার এ ভাবান্তর প্রথমে তেমন লক্ষ্য করেনি। ভেবেছিল অনেক দিনের পর বাপেরবাড়ি গিয়ে মনটা তার দুর্ব্বল হয়ে গিয়েছে। কিন্তু ক্রমশই তৃষ্ণার অসন্তোষ এত কথায়-কথায় বেড়ে উঠতে লাগল যে চোখ বুজে আর থাকা যায় না। জয়ন্ত বিব্রত বোধ করে কিন্তু ঠিক্ কি যে কর্ব্বে তাও বুঝে উঠতে পারে না।

একদিন আফিস থেকে ফিরে দেখল তৃষ্ণা কোথাও নেই।

অনেক খুঁজে আবিষ্কার করল তৃষ্ণা দোতলার ছাতের কোণে ঘুলঘুলিতে মুখ রেখে চুপ করে বসে আছে।

জয়ন্ত ডাকল—"তৃষ্ণা, তুমি এখানে ব'সে? আর আমি সারা বাড়ি খুঁজে হয়রান। একলাটি বসে কি করছিলে, গো!"

অবিবাহিত বন্ধুরা বলে জয়ন্তর এই মিষ্টি ডাকটির জন্যে তারা নাকি কৌমার-ব্রত ত্যাগ করতে রাজি।

তৃষ্ণা কোনো জবাব না দিয়ে জয়ন্তর দিকে মুখ ফেরাল। চোখের পাতা ঈষৎ ভারী, পল্লবের প্রান্তে সজলতার স্পর্শ। মুখে রাজ্যের বিষাদের ভার নেমে এসেছে। আর্টিস্ট জয়ন্তর চোখে ভালো লাগল এই ধারাসিক্ত ধবণীর স্ফীত সরসতা। কিন্তু স্বামী জয়ন্তর মন তখন আগামী অশান্তির ছায়ায় ম্লান হয়ে উঠেছে। তবু তৃষ্ণার চেহারা দেখে জয়ন্তর কেমন যেন মায়া করতে লাগল। ভাবল—"বেচারী! একা-একা থাকে এই বিদেশ-বিভূঁই জায়গায়। একটা মনের মত সঙ্গী-সাথী নেই যে দু'দণ্ড মন খুলে যে-যার নিজের কথা বলতে পারে! সেলাই আর বই নিয়ে কত আর সময় কাটে!"

কাছে এসে তৃষ্ণার হাত সস্নেহে টেনে নিল জয়ন্ত। তৃষ্ণা উঠে পড়তেই কোল থেকে মাটিতে পড়ে গেল একখানা বই। জয়ন্ত বইখানা কুড়িয়ে নিয়ে দেখল বাংলা উপন্যাস—বহু-বিজ্ঞাপিত নাম-করা বই 'রঙীন প্রভাত'।

ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত করে জয়ন্ত বললে—"কি বাজে বই পড়ো সারাদিন ধরে? তার চেয়ে……"

তৃষ্ণা বইখানা ছিনিয়ে নিল স্বামীর হাত থেকে। তারপর পিছন ফিরে সে কী কান্না······বর্ষণের বিরাম নেই। তৃষ্ণাকে সুস্থ করতে জয়ন্তকে অনেক সাধ্যসাধনা করতে হয়েছিল সে রাত্রে।

কিন্তু এ তো গেল সামান্য তুচ্ছ ঘটনা যা' নিত্য লেগে আছে বললেই হয়। জয়ন্ত কাজ সেরে বাড়ী এসে প্রায়ই দেখে—হয় তৃষ্ণার মুখ ভারি, নয়ত মন খারাপ হবার সূত্রপাত। প্রথম প্রথম তৃষ্ণার নিঃসঙ্গ অবস্থার জন্যে তার মন সহানুভূতিতে ভরে উঠত। কিন্তু আজকাল কেমন যেন একটা উদাসী ভাব তার মনকে অধিকার করে বসছে যেটা ভালো লক্ষণ নয়, জয়ন্ত বুঝতে পারে। এই প্রতিনিয়ত মান-অভিমান আর তেমন মিষ্ট ও শোভন লাগে না,—মনে হয় কোথায় একটা গভীর অসামঞ্জস্য রয়ে গেছে যেটি ঠিক ধরা যাচ্ছে না।

কোনো-কোনো দিন তৃষ্ণা একেবারেই নাগাল দেয় না। মন ভারি করে' এঘর ওঘর ঘুরে বেড়ায়। জয়ন্তর কথার সংক্ষিপ্ত অসংলগ্ন জবাব দেয়, নয়ত একেবারেই দেয় না, চুপ করে থাকে। জয়ন্ত বেশ বুঝতে পারে, তৃষ্ণার মনে কিছু একটা বড় রকমের অভাব অথবা অভিযোগ আছে। কিন্তু নিজের তরফ থেকে খোলাখুলি মীমাংসা করে নেবার মত ধৈর্য্য অথবা উদ্যম কোনোটাই তার নেই। এক এক সময় বিরক্ত হয়ে ভাবে—যা হচ্ছে হোক্। অনর্থক কোনো জিনিষ নিয়ে টানাটানি করলে সেটা ছিঁড়েই যায়, তখন তা নিয়ে জোড়াতালি দেওয়া চলে না। সে যখন এ চাকরি নিয়ে বিদেশে এল, তৃষ্ণা সঙ্গে না এলেই পারত!

সে ত মাথার দিব্যি দিয়ে সাধতে বসেনি। জেনে-শুনেই স্বামীব ঘর করতে এসেছে, বাপেরবাড়ি ছেড়ে থাকতে হবে কিংবা সাংসারিক কয়েকটা অসুবিধা ভোগ করতে হবে, একথা পূর্ব্বে তৃষ্ণার ভাবা উচিত ছিল। তাছাড়া বয়েসও ত বাড়ছে। একা সংসার চালাবার মত বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা তার নিশ্চয়ই হয়েছে। আর কোন স্ত্রীই বা স্বামীর সংসার করতে বিদেশে যাবার নামে নেচে না ওঠে! মা-টিও বেশ। আসবার সময় তৃষ্ণাব গলা জড়িয়ে সে কি মরাকান্না! মেয়ের বৈধব্য হলেও বোধ হয় এমন শোক দেখা যায় না। তিনদিন মেয়েকে সঙ্গে রেখে এমন পেট-পুরে খাইয়ে বিদেয় দিলেন যে জামাই যদি মেয়েকে এক মাস মেয়েকে অনাহারে রাখে, তা হলেও তার কাবু হবার উপায় নেই।

কি চায় তৃষ্ণা? জয়ন্ত পুরুষ মানুষ হয়ে সমস্ত কাজকর্ম্ম সামাজিকতা বিসর্জ্জন দিয়ে তৃষ্ণার আঁচল ধরে বসে থাকুক, তাই কি সে চায়? আর চাইলেই বা চলে কি করে? জয়ন্ত ভাবে—যাক্ গে, ওদিকে বেশি নজর না দেওয়াই ভালো। স্ত্রীলোকের মনের কথা আর চিন্তার অন্ত যখন বিজ্ঞ শাস্ত্রকারেরা অসম্ভব বলে ছেড়ে দিয়েছেন, তখন সে চেষ্টা করার কোনো অর্থ নেই। অবসর মুহূর্ত্তে মানুষ চায় সরসতা, চায় শান্তি। সে সময়টুকু যদি স্ত্রীর অহেতুক অসন্তোষের রহস্য আবিষ্কারে মাথা খুঁড়তে হয়, তা হলে বেঁচে থাকায় সুখ কোথায়? তবে জয়ন্ত অকর্ত্তব্য কখনো করতে পারবে না! তৃষ্ণার এই অসঙ্গত

আচরণের জন্যে সে নির্ব্বিকার হতে পারে, বিরক্ত বোধ করতে পারে, কিন্তু তৃষ্ণাকে অযত্ন বা উপেক্ষা কখনো সে করতে পারবে না। মনে পড়ে, বিয়ের আগের দিনগুলি। তা হলে, সেই ভালোবাসার খাতিরে অশান্তিকে মেনে নিতেই হবে। উদ্ভ্রান্ত হলে চলবে না, আরো ধৈর্য্যের প্রয়োজন। আদর্শবাদী জয়ন্ত দাম্পত্য জীবনের কর্ত্তব্যকে অতিরিক্ত মূল্য দিয়ে বসে।

সেদিন সন্ধ্যার সময় বাসায় ফিরে জয়ন্ত দেখলে, তৃষ্ণা ঘুমুচ্ছে। বোধ হয় সবে ঘুমিয়েছে, শিথিল মুঠি থেকে খসে-পড়া বইখানা বিছানায় পড়ে'। জয়ন্ত সন্তর্পণে বিছানার কাছে এসে দাঁড়াল, যেন তৃষ্ণার ঘুম না ভাঙ্গে। দেখলে নাকের আর গালের ওপর কয়েক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ে শুকিয়ে গেছে। জয়ন্ত অনেকক্ষণ ধরে' তৃষ্ণার শিথিল শয়নভঙ্গীর ম্লান মাধুরী চোখ ভরে দেখতে লাগল। হঠাৎ মনে প্রবল ইচ্ছা হ'ল, তৃষ্ণাকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে নিষ্কলুষ স্নেহে তার সকল গ্লানি ও ব্যথা মুছিয়ে দেয়। কাছে সরে' এসে হঠাৎ কৌতূহল-বশে জয়ন্ত ধীরে ধীরে বইখানা তৃষ্ণার হাত থেকে তুলে নিয়ে দেখলে—সত্যেন্দ্রনাথের 'কাব্যসঞ্চয়ন'। পাতা উলটিয়ে আবিষ্কার করল কবিতাটি, যেখানে তৃষ্ণা আঙুল রেখে ঘুমিয়ে পড়েছিল—'বরভিক্ষা'।

বিছানার এক কোণে বসে জয়ন্ত কবিতাটিকে আপন মনে পাঠ করতে লাগল—ছন্দের লালিত্যে আর ভাবের মাধুর্য্যে কখন সে যে আত্মবিস্মৃত হয়ে আবৃত্তি করতে সুরু করেছে, তা

খেয়াল করেনি। তৃষ্ণা ঘুম ভেঙ্গে দেখে বিছানায় জয়ন্ত। জিজ্ঞাসা করল "কি পড়ছ?" জয়ন্ত কবিতাটি দেখাল। মনস্কভাবে তৃষ্ণা বললে "একটু পড়ো, শুনব।"

জয়ন্ত সুললিত স্বরে আবৃত্তি করে যায়—

কহিছে ওহারু করজোড়ে, "প্রভু!
দাও মোরে হেন, বর
উৎসুক যার উষ্ণ নিশাসে
নিবে আসে চরাচর;—
নিঃশ্বাসে যার নেশা হয় ক্ষণে
ক্ষণেকে দৃষ্টি হরে!"
ওহারুর বুকে চন্দ্রমল্লি
চেরি-ফুল থরে থরে।
"দাও প্রজাপতি! দাও মোরে পতি
দাও মোরে হেন, বর—
গোপন সানুর মর্ম্মর সম
যার কণ্ঠের স্বর;—"

তৃষ্ণা ব্যথিত হয়ে বলে ওঠে "ওখানটা থাক্—তারপরে পড়ো"। কণ্ঠস্বর যেন নিরাশ। জয়ন্ত তার মুখের দিকে একবার তাকায়, আবার পড়তে সুরু করে—

"দাও হেন বর সাগরের মত
গম্ভীর যার বাণী,

আন্‌-ভুবনের অজানা সুরভি
পরাণে মিলাবে আনি'
কল্প-আঙুলে ফুটাবে যে মোর
সকল পাপ্‌ড়িগুলি !"
ওহারুর বুকে চন্দ্রমল্লি
চেরি ফুল উঠে দুলি'।

তৃষ্ণা বাধা দিয়ে প্রশ্ন করে—"শুন্‌ছ ?"

"কি ?"

"আচ্ছা, দেখো, জাপানীরা খুব সুন্দর করে' প্রেম করতে জানে,—না ?"

"হ্যাঁ, তবে ফরাসীরা আরও—"

"কিন্তু বাঙালীরা ? কেবল প্রেমের কথাই লেখে। কতো সুন্দর ভাবে জীবন কাটানো যায় প্রেমের ভিতর দিয়ে. সে কথা কেউ বলতে জানে না। আমাদের কাছে প্রেম যেন পোষাকী জিনিষ, মোটেই সহজ নয়।

"কারণ বোধ করি, ভাবালু লোকের কাছে প্রেমের হঠাৎ সব-ভাসিয়ে নিয়ে-যাওয়া রূপটাই আগে ফুটে ওঠে। তাই প্রথম মুহূর্ত্তটাই তার কাছে সেরা অভিজ্ঞতা।"

একটু চুপ করে থেকে তৃষ্ণা বলে—"হ্যাঁ, প্রেম জীবনে আসে হঠাৎ। কিন্তু তাকে তাজা রাখতে হলে, বাঁচাতে হলে চাই আর্ট। না ?"

জবাব দেয় না জয়ন্ত। তার আদর্শ আছে, রোমান্সের

মূল্যও সে বোঝে। কিন্তু মনের প্রসার ও স্বাস্থ্যকে সে আরো বড় করে' দেখে। তৃষ্ণাকে সে ভালোবেসেছে প্রচুর। তিন বছর বিয়ে হয়ে গেলেও তৃষ্ণার প্রতি আন্তরিক মমত্ববোধ তার এতোটুকু ম্লান হয় নি। কেবল সে সইতে পারে না একটা দামী অনুভূতির খেলো বিড়ম্বনা। কি জানি কেন, পুরুষ বলেই হোক্ অথবা অন্য কোনো কারণেই হোক্, প্রেমের কথা পেড়ে সবিস্তারে তার আলোচনা করতে সে সঙ্কোচ বোধ করে রীতিমত। জয়ন্তর ধারণা—ওটা নিতান্তই অন্তরের সামগ্রী, মর্ম্মমূলের গভীরে যার বসতি, স্বতঃস্ফূর্ত্ত যার প্রকাশ। প্রেম-করা ভালো এবং দরকারী। প্রেমের কবিতা আরো ভালো পড়তে। কিন্তু পুঁথির চরণের সঙ্গে হৃদয়ের অদৃশ্য চারণের সঙ্গতি খুঁজতে যাওয়া মূর্খতা। অন্তর-ভুবনকে প্রেম উদার আলোকে উদ্‌ভাসিত করে দিক্, মনকে সবল ঋজু ও মধুর করে দিক্, পরকে আপন করে টানুক্। রুক্ষ প্রান্তরের বুকে বর্ষার শ্যাম ছায়ার মত প্রেম মানুষের জীবনে তার অনুরাগস্পর্শ আনত করে রাখুক্। কিন্তু তার রহস্য আর রূপব্যাখ্যা সাড়ম্বরে আলোচনা করা কিংবা বাস্তব জীবনের সঙ্গে কাব্যজগতের অসম্ভব মিল সন্ধান করে বেড়ানো জয়ন্তর কাছে হাস্যকর মনে হয়, এমন কি বেয়াদপি ঠেকে।

তৃষ্ণা সহসা আব্‌দার করে বলে—"শোনো!"

জয়ন্তর চমক ভাঙ্গে, বলে "কি?"

"শোনোই না, কাছে সরে এসো।"

কাছে সরে আসে জয়ন্ত, বাধ্য শিশুর মত কথা শোনে। এবার ঘনিয়ে-ওঠা নিবিড় মুহূর্ত্তের প্রতীক্ষায় স্পষ্ট হয়ে ওঠে তৃষ্ণার কাতরতা।

অপরের ফরমায়েশী কাব্যরচনা কিংবা সঙ্গীতচর্চ্চা যেমন অসম্ভব বললেই চলে, আদেশমাফিক অন্তরঙ্গতা কিংবা প্রণয়ের সহজ লীলা তেমনি বিমুখ হয়ে যায়। দ্বিধাদুর্ব্বল অর্দ্ধগতিতে জয়ন্ত ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করে একবার সেই পুরাণো দিনের স্বাভাবিক আকুলতা। কিন্তু সে চেষ্টা আপ্রাণ হয়েও নিষ্প্রাণ। নিত্যকার জীবনে ক্ষুণ্ণ হয়েছে প্রীতি অভিমানের অসরলতায়। যে সুর ম্লান, যে বর্ণ নিষ্প্রভ হয়ে গিয়েছে চেতনার সঙ্কীর্ণ বঙ্কিম পথে, তাদের স্ফুটতর উজ্জ্বলতর করা এখন আয়ত্তের বাইরে।

তৃষ্ণার চোখে-মুখে নৈরাশ্য। জয়ন্ত নিষ্ফল চেষ্টায় দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে, সে নিঃশ্বাসের শীতল স্পর্শ লাগে তৃষ্ণার গালে। চম্‌কে ওঠে তৃষ্ণা, বলে—"আচ্ছা তোমার নিঃশ্বাস এত ঠাণ্ডা কেন?"

দুজনে দুদিকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

জয়ন্ত একরকম হাল ছেড়ে দিয়েছে। চেষ্টার ক্রটি সে করেনি কিন্তু তৃষ্ণাকে সুখী করা তার কপালে নেই। কিসে তার মন ভালো থাকে, জয়ন্ত তাই নিয়ে রীতিমত গবেষণা করেছে। হয়ত ক্ষণিক আনন্দে তৃষ্ণা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই সে উত্তেজনা ফুরিয়ে গেছে; আবার এসেছে

প্রচুর অবসাদ, গভীর হতাশার অনুদ্দেশ ক্লান্তি। আধুনিক রুচিসম্মত আসবাবে প্রসাধনে ঘর বোঝাই করে দিয়েছে জয়ন্ত স্তূপাকার শাড়ী আর দামী ব্লাউজে তৃষ্ণার আলমারী, বাক্স ওয়ার্ড্রোবে আর স্থান সঙ্কুলান হয় না। সৌখীন গয়নার রাশ তালাই থাকে, কচিৎ ব্যবহারের পর সিন্দুকের অন্ধকারে আত্ম-গোপন করে। কি যে অভাব তৃষ্ণার—জানিতে পারে না জয়ন্ত। অনিশ্চয়তার অন্ধকারে বাস করতে করতে সে এক রকম অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছে, তবু দুশ্চিন্তা চলে। মনে হয়, যদি ঘুণাক্ষরেও বোঝা যেত। চকিতের মধ্যে একটা দারুণতম দুশ্চিন্তা বিভীষিকা হয়ে জয়ন্তর মনে উঁকি দিয়ে যায়। কিন্তু ভদ্র জয়ন্ত, বিশ্বাস-পরায়ণ জয়ন্ত তখুনি সে সংশয় মন থেকে অসীম দৃঢ়তার সঙ্গে দূর করে দেয়। এমন কোনো ঘটনা নেই, এমন কোনো মানুষ নেই যার পিছনে কিছু না ইতিহাস আছে। কিন্তু প্রত্যেক ইতিহাস লজ্জার কারণ না হতেও পারে। আর তাই নাকি সম্ভব! এতদিন কোনো চঞ্চলতা, কোনো অশোভন আচরণ ধরা গেল না, আর আজ······? জয়ন্ত মনকে বোঝায়।

তবু মাঝে মাঝে একটা প্রশ্ন দৈত্যের মত মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে, আলোড়ন জাগায়। কিন্তু কই, সন্দেহজনক কারণ কিছু খুঁজে পাওয়া যায় না। মিললে বোধ হয় ভালোই হয়, জয়ন্ত ভাবে। অন্ততঃ একটা কিছু হেস্তনেস্ত হয়ে যায়। বোঝা যায়, কোথায় দাঁড়িয়ে আছি—শক্ত মাটিতে না চোরাবালিতে।

নাঃ, ওসব চিন্তায় নিজেরি স্বাস্থ্যনষ্ট; মনঃকষ্ট। জয়ন্ত

সেগুলোকে মনের কোণেও জায়গা দেবে না। কিন্তু—সেবার বাপের বাড়ি থেকে ফিরেই তৃষ্ণার এমন পরিবর্ত্তন হ'ল কেন? যে মেয়ে ছিল সরল, সরস ও জীবন্ত, তার এ ভাবান্তরের হেতুটা কি—সেটাও ত একটা ভাববার কথা। জয়ন্ত নিজেকে বোঝায়, হয়ত এ পরিবর্ত্তন স্বাভাবিক। বয়সের ধর্ম্ম। জীবনে স্বামী, সংসার—এ সবের দায়িত্ব এসেছে, হয়ত সেই কারণেই। কিন্তু না—তৃষ্ণা এখুনি কিছু প্রৌঢ়ত্বের শেষ সীমায় এসে পৌঁছয়নি আর সংসারের দায়িত্ব-চাপ এমন কিছু গুরুভার নয়। মানুষের স্বভাব খানিকটা বদলে যায় বটে, কালগুণে এবং সে বদলটা আকস্মিক হলেও খুব আশ্চর্য্য না হতে পারে। তবু হৃদয়ের পরিবর্ত্তন কি এতই সহজে হয়? এতদিন ধরে' যাকে আমি উচ্ছ্বসিত, প্রাণবান বলে জেনে এসেছি, আজ হঠাৎ তাকে নিস্প্রাণ, নির্জীব দেখে বল্‌ব—এটা স্বাভাবিক! স্ত্রীলোকের মনোরাজ্যে তার গতিবিধি অবাধ নয়। তাই বলে তৃষ্ণাকে একটা হেঁয়ালি বলে' ছেড়ে দিতেও মন সরে না। প্রত্যক্ষ প্রহেলিকার সঙ্গে নিত্য কারবার—এর চেয়ে কঠিন পরীক্ষা আর কি থাকতে পারে?

তৃষ্ণার বিরূপ মনোভাবের অর্থভেদ করতে গিয়ে জয়ন্ত কতদিন নিজেকে নির্ম্মম বিশ্লেষণ করেছে। দোষ ত্রুটি তার আছে নিশ্চয়ই, কিন্তু এমন মারাত্মক কিছু খুঁজে পায় না সে, যার সমস্যাটা নিশ্চিন্ত মনে ঝুলিয়ে দিতে পারে। দৈহিক বিধানে দুজনের মধ্যে কোনো অমিল নেই, মনের সামঞ্জস্য অন্ততঃ

এতদিন পর্য্যন্ত ভালোই ছিল। তৃষ্ণাকে সে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছে, কোনো কাজেই সে হস্তক্ষেপ করে না। গায়ে-পড়ে উপদেশ দেওয়া জয়ন্তর ধাতে নেই, আদেশ করা ত দূরের কথা। বোধ হয়, এর চেয়ে জোর খাটানো কিংবা দাবি করাই ছিল ভালো। তবে জয়ন্ত একটা জিনিষ ভালো করে' নজর করেছে এবং বুঝেছে যে তৃষ্ণার মন যখনই একলা, কোনো কাজে আবদ্ধ না থাকে, তখনই এই অশান্তির ঢেউ ওঠে। যতক্ষণ তৃষ্ণা বই না পড়ে, ততক্ষণ সে থাকে ভালো। বই, বিশেষ করে' প্রেমের বই—কি কবিতা, কি উপন্যাস—পড়লেই তার মনের অন্ধকার দ্বিগুণ ছেয়ে আসে। আর এ জাতীয় কাব্য-সাহিত্যের ওপর তৃষ্ণা তার সহজে মেটে না। একটা ছেলেমানুষি লোলুপতায় সে আত্মহারা হয়ে পড়ে।

জয়ন্ত আজকাল বাঙলা উপন্যাস কেনা বন্ধ করে দিয়েছে, লাইব্রেরি থেকে ভ্রমণ-কাহিনী কিংবা প্রবন্ধের বই ছাড়া আর কিছু আনে না। ভাবে—দেখাই যাক্। পরীক্ষার ফল কি দাঁড়ায়! প্রেমেব অবাস্তব বর্ণনা পড়ে পড়ে তৃষ্ণার ভাবপ্রবণ মন উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে উঠেছে। একটু উচ্ছ্বাস কমানো দরকার, নইলে শেষ পর্য্যন্ত আশ্রম অবধি গড়াবে। তৃষ্ণা যে বই পড়ে জীবনের সঙ্গে মেলাতে যায়—নিজের জীবনের সঙ্গে কল্পিত অস্তিত্বের সামঞ্জস্য খুঁজতে গিয়ে নিরাশ হয়, এ বিষয়ে জয়ন্তর কোনও সন্দেহ নেই। জয়ন্ত সে স্থির করেছে—তৃষ্ণার প্রেমে সে বঞ্চিত হোক্, সে বেদনা সহ্য করার মত শক্তি তার আছে। কিন্তু প্রেমের মানদণ্ডে

যাচাই হয়ে নিকৃষ্ট পুরুষের পর্য্যায়ে পড়তে তার মোটেই রুচি নেই। যে করেই হোক্ তাকে এটা দেখতে হবে, যেন তৃষ্ণার চোখে সে ধীরে ধীরে নেমে না যায়। এর চেয়ে তৃষ্ণা প্রেম ছেড়ে পাঁজি ধরুক না কেন? নিত্যকর্ম্মে আর ব্রতাচরণে সে যদি শুচিপরায়ণ সাত্ত্বিক মানুষ হয়ে ওঠে, তাও সে সহ্য করতে প্রস্তুত। সন্ন্যাসিনীর ভৈরব স্বামিদেবতা সেজে পাদোদক বিতরণ করতে তার আপত্তি নেই। কিন্তু উদাসিনী তৃষ্ণার আদর্শচ্যুত প্রেমিক হতে জয়ন্ত কখনো রাজি হবে না।

তৃষ্ণা যখন চুপি-চুপি রাতের অন্ধকারে জয়ন্তর কানে অনেক দিনের প্রতীক্ষিত সেই শুভ সংবাদটি দিলে, জয়ন্ত সে মুহূর্ত্তটি চিরকাল মনে রাখবে। বহুদিন হ'ল—তৃষ্ণাকে এতো নিবিড় করে সে পায়নি। সন্তান-সম্ভাবনার দুঃসহ পুলকবেদনা যেমনি অধীর তেমনি সংক্রামক। কত জল্পনা কল্পনা, কত অর্থহীন গম্ভীর আলাপ একটি ছোটো অতিথিকে কেন্দ্র করে'! তারপর হঠাৎ অশ্রুর বন্যা! যেন কতদিনের নিরুদ্ধ গ্লানি, পুঞ্জীভূত অপচয় বাঁধ ভেঙ্গে তৃষ্ণার আবিল মনের দুই তট প্লাবিত করে দিয়েছে। সে রাতের নিবিড় সান্নিধ্য জয়ন্ত ভুলতে পারে না। বিয়ের পর যে প্রথম অনুভূতি তীব্র স্পর্শে দেহ-মনকে নতুন জীবন এনে দেয়, তারি বিস্ময় যেন আজ চেতনাকে আচ্ছন্ন করে রাখে। জয়ন্তর আশা বুঝি এতদিনে সফল হতে চলল। তৃষ্ণার কোলে যে শিশু আসছে, তারি ঘটকতায় দুটি সরে-যাওয়া

প্রাণীর মনের মিল হতে যেন আর দেরী নেই। স্বপ্নজালের সূক্ষ্ম সুতোয় জাল-বুননি চলে।

প্রথমটা নতুনত্বের মোহ যেন তৃষ্ণাকে পেয়ে বসল। এ সম্পদ কোথায় রেখে সে যে নিশ্চিন্ত হবে, ভেবে ঠিক করতে পারে না। নবীন অতিথিকে সব রকমে পরিচর্য্যা করেও মনে হয় যেন যথাযোগ্য আদর-যত্ন থেকে তাকে বঞ্চনা করা হচ্ছে কোথায় একটা বড় রকমের ত্রুটি রয়ে-গেল। জয়ন্ত এদিকে হাঁপ ছেড়ে বাঁচে। তৃষ্ণা যে এতদিনে তার তৃষ্ণার জল পেয়ে সুস্থ হতে পেরেছে, নতুন পিতৃত্বের মর্য্যাদার চাইতেও সেইটেই তার কাছে বেশি কাম্য। দুজনে শিশুকে নিয়ে মিছিমিছি কলরব করে, ভবিষ্যতের আশা ভরসা নিয়ে আলোচনা করে। তৃষ্ণাও অনেকটা যেন সহজ হয়ে এসেছে। কেবল বাইরের লোকের কাছে নয়, নিভৃতেও জয়ন্তর সঙ্গে ব্যবহার করে পুরাণো দিনের পরিচিত আবহাওয়ায়। অনেক দিনের পরে যেন ব্যথায় আড়ষ্ট অঙ্গের নীচে রক্ত চলাচল শুরু হয়েছে।

মাঝে প্রায় বছর দুই কেটেছে। জয়ন্ত আর তৃষ্ণার যৌথ-জীবন আবার প্রথম-চলা নির্ব্বিবাদ যাত্রাপথ খুঁজে পেয়েছে। সেই আতঙ্ক, সশঙ্ক মনোভাব আর নেই।

একদিন রাত্রে বাড়ী ফিরে জয়ন্ত দেখলে খোকা ঘুমিয়ে পড়েছে। তার ছোট্ট বিছানার পাশে তৃষ্ণা বই হাতে করে' উদাস নয়নে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে। এ চাউনি ভোলবার নয়; জয়ন্ত প্রমাদ গণল। এবার সে ঠিক করে

ফেলল, আর বাড়তে দেওয়া উচিত নয়। যা হোক্ একটা ব্যবস্থা করতেই হবে, নইলে দিনের পর দিন অসহ্য অশান্তির বোঝা। রক্তচাপ অনিবার্য্য। জয়ন্ত স্থির করল, চাকরি ছেড়ে দিয়ে বাড়ী ফিরে যাবে। সেখানে বৃহৎ সংসার, পাঁচজনের সামনে তৃষ্ণার মন হয়ত বদলাবে। অন্ততঃ; খানিকটা অন্য-মনস্ক হয়ে কাজে ব্যস্ত থাকলে আপনার বেদনারহস্য আপনি ভুলে থাকবে। তৃষ্ণাকে বললে—সে ছুটি নিচ্ছে। শরীর বড় ক্লান্ত। তৃষ্ণা জবাব দিল না, চুপ করে রইল।

কলকাতায় ফিরে দিন কয়েক তৃষ্ণা ভালোই রইল। কিন্তু জয়ন্ত স্পষ্ট বুঝতে পারে, সুর এখন জোড়া লাগেনি এবং ভবিষ্যতে যে লাগবে তার কোনো আশ্বাস নেই। খোঁটায়-বাঁধা গরুর মত সংসার-চক্রে ঘোরা নিশ্চয়ই প্রেমের বিকৃতি। আবার তেমনি, দুটো স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের নিত্য গোঁজামিলন প্রেমের খাতিরেও অচল। সামনে লম্বা ছুটি। কি করা যায়! জয়ন্ত ভাবলে—একবার লম্বা পাড়ি দিতে হবে এবং একলা। বেশ কিছুদিন নিরিবিলিতে নতুন জায়গায় থাকলে মনের স্বাস্থ্যটা হয়ত ফিরবে। তবে মানুষের সঙ্গ-তে তার অরুচি ধরে গেছে, বিশেষ করে ভদ্রসমাজের।

বছরখানেক পরে জয়ন্তর চিঠি এল :

কল্যাণীয়াসু,

আমি পাহাড়ে এসে পৌঁছেচি মাত্র দিন কয়েক। কিন্তু

গত বছর ধরে' যে সব নানান্ জায়গায় ঘুরে বেড়িয়েছি, তাতে শরীরটা খন সামলেছে। কিছুদিন এই জনবিরল পাহাড়ী উপত্যকায় একলা থাকলে আমি বোধ হয় বেশ বদলে যাব। সম্পূর্ণ বিশ্রামই চেয়েছিলাম, মনের এবং দেহের। তা মিলেছে। আমায় নিয়ে আত্মরতই ছিলুম, আত্মশুদ্ধ হতে পারিনি।

এই নির্জ্জন ছোট্ট কুটীরে এসে আশ্রয় নিয়েছি কয়েকটা অশিক্ষিত পাহাড়ী চাষীর কাছে। তারা সাধাসিধে লোক, তারা মানুষকে বোঝে আর মাটিকে। এই বন্ধ্যা পাথুরে মাটিতে তারা দিনের পর দিন অমানুষিক পরিশ্রম করে, রুক্ষ আকাশ আর নিথর দেবতার সঙ্গে প্রাণপণ লড়াই চালিয়ে সবুজের সৃষ্টি করে। কিন্তু এ নিরন্তর চেষ্টা ও জয়ের সম্মান অথবা উপযুক্ত মুনাফা তাদের কপালে মেলে না। এইটাই আফশোষ। এদের আঁট-সাট গড়ন আর হিম্মৎ, মানুষকে সরল বিশ্বাসে কাছে-টানার ক্ষমতা আমায় অভিভূত করে। এরা সভ্যতার ধারও ধারেনা অথচ সভ্য মানুষদের মধ্যে যে খাঁটি জিনিষটার শোচনীয় অভাব, সেটা এদের সহজাত। এদের মেরুদণ্ড আর চরিত্র—কোনোটাই আমাদের নেই। আমাদের কাছে যেটা রুগ্ণ ভাব-বিলাস আর অবাস্তব কল্পনা, তা নিয়ে ওরা মাথা ঘামায় না, কেননা ওদের কাছে সেটা জীবন্ত, প্রত্যক্ষ সত্য। প্রকৃতিকে ওরা সত্যিই চিনেছে, দিনের পর দিন হাতের মধ্যে পেয়েছে আর পেয়েছে বৃহত্তর সংঘের যৌথজীবন। আমার আশা হয়—এরা যেদিন নিজেদের দাবি জানাবে এবং জাহির

করবে, সেদিন তোমার আমার মতো দুয়ের-বার মান-সর্ব্বস্ব মানুষগুলোর অন্তিম দশা আসবে। এটা আমার সত্যি ধারণা, ব্যর্থতা গ্লানি কিংবা নিরুদ্ধ বৃত্তির বক্র গতি নয়।

কিন্তু এ সব বাজে কথা কেন লিখছি? তুমি হয়ত প্রত্যাশা করছ—পাহাড়ে সূর্য্যোদয়ের একটা রঙীন্ বর্ণনা, জীবন-প্রভাতের বর্ণচ্ছটা আর সেই সঙ্গে আমি তোমায় যত ভালোবাসি, বেসেছি এবং ফিরে গিয়ে আরো বাস্‌ব, তারি একটা বিস্তারিত ইস্তাহার। কিন্তু একটা কথা ভেবে দেখো—কতটুকু আমাদের অবসর, কত ছোট এই জীবন। যদি অভিনয় আর অভিমান আমাদের সবটুকু ধৈর্য্য আর সময় শুষে নেয়, তা হলে সাধারণ, সুস্থভাবে বাঁচব কখন? আগুনের আলো যেখানে অকৃপণভাবে ছড়ানো, সেখানে জানলা বন্ধ করে' ছিদ্রপথে দুটি একটি সৌখিন উল্কার রোমাঞ্চকর পরিণতি দেখার কোনো মানে আছে কি? কি করব, তৃষ্ণা—প্রেমে আমার বিতৃষ্ণা এসেছে, অর্থাৎ ভদ্রপ্রেমিকের আড়ষ্ট জীবনে আর ব্যবহারে। আজ এই খোলা জায়গায় দাঁড়িয়ে দেখছি দূর পাহাড়ের চূড়োগুলো শেষের নীচু আকাশটাকে নির্ম্মমভাবে বিঁধছে আর একটা চওড়া ধূলো-ওড়া পথ নীচেকার সহরতলীর দিকে দুরন্ত ইঙ্গিত জানাচ্ছে। সরল পাহাড়ী মেয়েরা সন্ধ্যায় এসে মিলছে ছেলেদের সঙ্গে অকুণ্ঠভাবে। তুমি এখনো নীল কাঁচের শেড্ লাগিয়ে কি কাব্য-আরাধনা করছ! দেখছ কল্পিত পূজারীর মোহদৃষ্টি!

এখানে আসার একান্ত প্রয়োজন ছিল, নইলে কখনোই নিজেকে যাচাই করবার সুযোগ পেতুম না। শুধু তোমায় ভালোবেসে আর অতৃপ্ত হয়ে মোটা মাইনের বাধা সড়কে অপূর্ণ জীবন সাঙ্গ করতুম। দেওয়া-নেওয়ার হিসেব দাখিল করতে বসিনি, কিন্তু তুমি যদি সহজ হতে, তাহলে সব কিছুই সহজ হত। তোমার কাছে আমার প্রত্যাশা কিছুই নেই, তবে আমি যে অভাবিত রূপে অন্য পথে এসে পড়লুম, তার জন্যে তোমার কাছে আমার ঋণ রইল। মানুষ আপনার সত্তা খুঁজে পায় নানা উপায়ে, নানা কারণে। তুমি একটা উপলক্ষ্য, আর বিগত দিনের অশান্তি একটা কারণ মাত্র। কিন্তু শক্ত খোলার নীচে থাকে অন্তঃসার, আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ— যেখানে কার্য্য-কারণ সম্পর্কটা পুরোপুরি খাটে না। কিছুদিন যদি বাঁচতে হয়, তা হলে খুঁতখুঁতে মন আর খিটখিটে মেজাজ, অপটু দেহ আর বেদান্ত-চর্চা নিয়ে বুড়ো হব না, এটা ঠিক্। তাই পালিয়েছি। তুমি কি করবে, জানি না। একটা কিছু পথ নিশ্চয়ই খুঁজে পাব। তবে আপাততঃ খোকাকে বড় করে' তোলার ভার তোমারই। আশা করি টাকাকড়ির অভাব অসুবিধে হয়নি না এবং হবে না। একটি গৃহপালিত পশু পরিশ্রম করে' গৃহস্থকে যতখানি কাজ দিতে পারে, ততখানি ভবিষ্যতের দায়িত্ব ব্যবস্থা আমি করে এসেছি।

রাতে তুমি আর ব্রোমাইড খেয়োনা, বরঞ্চ একটু বেশি করে বেড়িয়ো। দেহকে খাটিয়ে নিলে সে সুস্থ থাকে, মনের স্বাস্থ্যও

ফিরিয়ে দেয়। তোমার দিদি বোধ হয় এখন কাছেই আছেন এবং মা-ও। সবাই কি বড় বেশি সমবেদনা জানিয়ে তোমায় উত্যক্ত করছে? তুমি গায়ে মেখোনা।

তোমার হাত-খরচের টাকা জমাই আছে। তা' দিয়ে মনোমত কাঁচের বাসন ইত্যাদি কিনো। এতে তোমার মন ভালো থাকে। আমার কিন্তু ঠুনকো কাঁচের রঙচঙে সংসারে ফেরবার ইচ্ছে নেই। পারো ত খোকার একখানা নতুন ছবি এখানকার পোষ্টমাষ্টারের কেয়ারে পাঠিয়ো। এ গাঁয়ে পিয়ন আসার রীতি নেই। শুধু বছরে একবার আসে মেঘ আর নামে ঢল পাহাড়ী নদীতে। এখানকার মানুষরা যাতে মেরুদণ্ড বাঁকিয়ে না ফেলে, আমাদের মত মধ্যবিত্তের সোনালি স্বপ্নে না ভুলে নিজেরা সোনা ফলায় আর সুবিধাবাদী সংসারের আত্মসুখী কোমল উত্তাপে গলে না যায়, সে চেষ্টার ভারটুকু নিলুম। খোকা যদি বড় হয়ে আমাদের গড়া শিক্ষাদীক্ষার তরল লালিত্যেকে ঝেড়ে ফেলে, তবেই তাকে জগতে আনা আমার সার্থক। সে যেন এখন থেকেই ভদ্রবেশে শিশু-কবিতা আবৃত্তি করতে না শেখে, এইটে আমার বিশেষ অনুরোধ।

জয়ন্ত।

পুঃ—তোমার হাতে এমন কোনো কাজ ছিল না, যা তোমায় ঠিক রাখতে পারত। এখনও নেই, তবে সব দোষটা আমার কিংবা আমারি মত নির্বিকার অদৃষ্টের ওপর চাপিয়ো না। এদিকে, ক্ষোভে আর আক্রোশে একটা কিছু অবৈধ ব্যাপার

যে করে ফেলবে, সে রকম বেপরোয়া মনও তোমার নয়। কি জানি হয়ত ডায়েরী লিখবে নয়ত কুকুর পুষবে অথবা সভা-সমিতি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে। কিন্তু জনতার মাঝে নামবার বিপক্ষে রয়েছে তোমার কোমল কল্পনা আর রুচির আভিজাত্য। গৃহিণীর জীবন মনোমত না হলে, অল্প-স্বল্প সমাজ-সেবা করতে ও পারো। তবে তোমার দিদির সঙ্গটি ছেড়ো। তোমার বাপ-মায়ের দাম্পত্যজীবন মোটেই সুখের ছিল না, তাঁর কাছেই শুনেছি। সেটা আর বিশদভাবে তাঁর কাছে তোমার না শুনলেও চলবে। তবে দিদিব বিশ্লেষণে আর উপদেশে চালিত হয়ো না, এতদিন হয়েছ বলেই এই বিড়ম্বনা। বড গভীর তাঁর চাল, তিনি চান আমাকে। একটা কোনো বদ্ধ ধারণা যদি শিকড় গেড়ে বসে, তাকে উপড়ে ফেলা ভীষণ শক্ত, যেমন কল্পিত দুঃখ লালন করা জীবনের একটা মস্ত অভিশাপ।

একেবারে আর ফিরব না, এ কথা বলার মত আমার শক্তি এখনো আসেনি। তাই বলছি—আমার মতো তোমার পরি-বর্ত্তন যদি শীঘ্র আর সহজ হয়, এখানে চলে এসো, তৃষ্ণা। কিংবা তখনই ডেকো যখন বুঝবে নতুন জীবনকে আন্তরিক স্বীকার করার মতো সাহস তোমার হয়েছে।

সেকেণ্ডহ্যাণ্ড

আপনারা অনিলকে বোধহয় দেখেন নি? আগে কিন্তু প্রায়ই সে এ-পাড়ায় আস্‌ত।

বৌবাজার হিদারাম বাঁড়ুজ্যের গলিতে ঢুকে সোজা পূব দিকে চলে আস্‌লে কিছুক্ষণ পরে ডানদিকে একটা ছোট্ট অপরিসর গলি পাবেন। সেখানে ঢুকতে দিনের বেলাতেও হয়তো একটু গা ছম ছম করে। কিন্তু সাহস করে এগিয়ে গেলেই দেখবেন—দুধারে ঝুলে-পড়া বারান্দা-ওয়ালা বাড়ীর পিছন দিক্‌কার ইঁট-বার-করা দেয়ালগুলো অঙ্গে শত শত ঘুঁটের ঘা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে বলেই যা একটু অন্ধকার, নইলে একটু এগিয়ে গিয়ে বাঁ-হাতি আরো একটি সরু গলি খুঁজে পাবার মতো আলো হয়তো পাওয়া যায়। হ্যাঁ—ঠিক্‌ সাম্‌নে একটা ক্যানেস্তারার টিন্‌ দিয়ে ঘেরা ছোট্ট একটা ছাগলদের কুঠুরী আছে। সেই কাণা গলিটা এসে যে সোজা সুড়ঙ্গের মধ্যে আত্মগোপন করেছে--সেটাই অনিলদের বসত বাড়ী। হ্যাঁ—বাধানো ছোট্ট সরু গলির সমাধি-প্রান্তে একতলা জীর্ণ বাড়ী। তা হলে দেখেছেন? তা দেখবেন বই কি! আপনার খুড়শ্বশুর তো ঐ অঞ্চলেরই বনেদী লোক—লোহার কড়ি-বরগা না কিসের যেন ব্যবসা?

কিন্তু অনিলরা এখন আর সে বাড়ীতে থাকে না। বাড়ী বেচে দিয়ে এখন টালা না বেলগেছে কোথায় যেন গিয়ে বাস করছে। কলেজে পড়বার সময় তার সঙ্গে আমার আলাপ

হয়েছিল, পরে সে আলাপ ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হয়। অত্যন্ত হৃদয়বান্ ছেলে। আপনি যদি খামোকা তার কাছে কিছু টাকা চেয়ে বসেন, তাহলে নিজের দেবার সামর্থ্য না থাকলেও আর কারুর কাছ থেকে ধার করে এনে দেবে। সামর্থ্য নেই বললাম—তার কারণ সে ছিল বাস্তবিকই গরীব। তার যখন ন' বছর বয়েস, তখন তার বাবা তাকে আর তার মাকে পাড়াগাঁয়ের বাড়ী থেকে কলকাতায় নিয়ে আসেন—ঐ বাড়ীটাতেই। মাত্র দু হাজারে ওখানি তিনি কিনেছিলেন। গলির অতো ভেতরে বলেই এতো সস্তায় পেয়েছিলেন। কিন্তু আপত্তি করছে কে? অনিলের মা অনিলকে নিয়ে দেশের বাড়ীতে এতোদিন যৌথ পরিবারে বিনা মাইনের রাঁধুনী-কাজ করছিলেন। অতএব ঐ সুড়ঙ্গই তার স্বর্গ।

অনিলের বাবা কলকাতায় ভূষি মালের খবরদারী থেকে সাবানের কারখানায় হরেক রকমের কাজ করতে করতে অবশেষে ভাগ্যলক্ষ্মীর মুখ দেখলেন। চিৎপুর অঞ্চলে একটা সীন্ পেণ্ট্যরের দোকানে তুলির কাজ করতে গিয়ে সহসা তিনি যে কি প্রকারে 'দি গ্রাণ্ড বিজলা অপেরা কন্‌সার্ন (কুমারটুলি) লিমিটেড-এর একচ্ছত্র মালিক অঘোরচাঁদ নস্কর মশায়ের সুনজরে পড়ে গেলেন—সে এক অভাবিত বিস্ময়। অত্যন্ত কাজের লোক বলেই তিনি অধিকারী-বাবুর স্নেহভাজন হতে পেরেছিলেন। 'তারপর তাঁরি অপেরা-পার্টিতে অভিনয়ের জন্যে 'অজামিল, ভক্ত বিভীষণ, গাণ্ডীবকুমার, সুধন্বা-পরীক্ষা, বভ্রুবাহন-বিজয়, উলুপী-

পরিণয়, প্রমীলা-বিহার প্রভৃতি উপর্যুপরি আটাশ খানি যাত্রার নাটক লিখে দিয়ে এবং নিজে প্লে করে ঐ বাড়ী কিনলেন এবং স্ত্রী ও ছেলেকে নিয়ে কলকাতায় এলেন।

অনিল জীবনের বেশীর ভাগই কাটিয়েছে ঐ গলির ভেতরে। পৈতৃক বাড়ীটাকে পুরানো জীর্ণ অবস্থাতেই কেনা হয়েছিল, পরে অর্থাভাবে কোন দিন আর তার সংস্কার করা হয় নি। নোনা-ধরা দেয়াল, স্যাঁতসেতে মেঝে আর চূণকামবিহীন টালি-বের-করা ছাদ দেখে দেখে অনিল ছেলেবেলা থেকে অভ্যস্ত হয়ে গিছল। কলকাতা আসার কয়েক বছর পরেই তার বাপের অবস্থা ক্রমশ খারাপ হয়ে যায়। বটতলার প্রকাশক তাঁকে নগদ কিছু টাকা দিয়ে মুখবন্ধ করেছিল কিন্তু তার পরেই মুঠোবন্ধ করলে। ভদ্রলোক ছিলেন নিরীহ ব্যক্তি। কি করে সর্ব্ব-স্বত্ব সংরক্ষিত করতে হয়, ছাপার বাইরে তাঁর সে জ্ঞান ছিল না। আজ প্রৌঢ় বয়সে নতুন ক'রে কোন কাজ শিখবার ইচ্ছা বা উৎসাহ ছিল না। কোনো প্রকারে জোড়া-তাড়া দিয়ে পাড়ারই মধ্যে কয়েকখানা নড়বড়ে বেঞ্চি জোগাড় করে নিয়ে একটি ছোট্ট পাঠশালা খুলে ফেললেন। তাইতে গ্রাসরক্ষা হ'ত, কিন্তু আচ্ছাদন হয়তো মিলত না। বাপের অবস্থা যখন এমনি অসচ্ছল, তখন তার পড়াশুনার খরচ তো দূরের কথা, সংসারের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষের জোগাড় অনিলকেই করতে হ'ত। কাজেই পুরানো বই, পুরানো জামাকাপড় নিয়ে অনিলকে সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছিল।

অনিল অবশ্য একদিনেই আমাকে এতো কথা বলে নি। ক্রমিক অন্তরঙ্গতার ফলে ধীরে ও সন্তর্পণে তার আজীবন দারিদ্র্যের কাহিনী অথবা সাধনার কথা আবিষ্কার করতে পেরেছিলাম। অনিলের ছিল প্রচণ্ড আত্মাভিমান। সেটা অবশ্য অল্পবিস্তর সকল মধ্যবিত্তের মধ্যেই থাকে; কিন্তু অনিলের ক্ষেত্রে সেটা ছিল আতিশয্যেরই নামান্তর। কলেজে অভিজাত ছাত্র দূরে থাকুক, সচ্ছল গৃহস্থ পরিবারের ছেলেদেরও সে সযত্নে এড়িয়ে চলত। কেবল কি কারণে জানি না, আমাদের দু একজনের সঙ্গে মিশত। তাগিদটা তার দিক্ থেকে নয়, আমাদের তরফ থেকেই। গরীবকে উপকৃত করবার বাসনায় নয় অথবা মার্জিত কৌতূহলের বশেও নয়। এমনি যেতাম তার কাছে। ঐ মলিন বেশ, আর দারিদ্র্যশীর্ণ মুখের পিছনে এমন একটা দুর্বার আকর্ষণ ছিল, যেটাকে মোহ বলা যায় এবং যারি আকর্ষণে নিত্য ছুটির পরে তার পিছু পিছু ধাওয়া করতাম। তখন তার বাপের মৃত্যু হয়েছে। ঐ জীর্ণ বাড়ীটায় থাকৃত অনিল এবং তার মা।

অনিল আমাকে সব কথা পরিষ্কার করে কখনো বলেনি কিন্তু তার মা ছিলেন সাদাসিদে বাঙ্গালী মেয়ের স্নেহশীল আন্তরিকতায় প্রাণবন্ত। অনিলের অনুপস্থিতিতে তিনি আমার সঙ্গে প্রায়ই গল্প করতেন। একদিন কথার ফাঁকে আবিষ্কার করলাম যে 'অনিলদের অসচ্ছল অবস্থা বর্ত্তমানে একেবারেই অচল হয়ে উঠেছে। পুঁজি বা সম্বল বলতে কিছুই নেই, কেবল মায়ের

একজোড়া বালা ও সাবেকী আমলের চিক্‌-ছড়াটা। আর আছে ঐ ফুটো একতলা কোঠাখানি। কিন্তু তা-ই বা কে কিন্‌ছে? অনিলের জন্যে অবশ্য একটি সব্‌-জজের পাঁঠা জোগাড় করেছিলাম, টুইশনির টাকায় কিছু সাহায্য হ'ত। অনিলের মেধাশক্তি ছিল তীক্ষ্ণ রকমের, কাজেই বি-এটা সে অনায়াসেই উত্তীর্ণ হতে পারলে। কিন্তু কলেজের ঐ কেতাববন্দী বিদ্যায় তার পড়াশুনো খতম হয় নি! এর-ওর কাছে চেয়ে আর লাইব্রেরী থেকে এনে বই পড়েছিল সে প্রচুর। বই পড়াটা তার নিঃশ্বাস নেওয়ার মতোই সহজ ও দরকারী দৈহিক প্রক্রিয়া ছিল। কারণ অসহ্য কলিক্‌ পেন্‌-এর মাঝখানে তাকে একদম বইয়ের মধ্যে তলিয়ে যেতে দেখেছি। এ ছাড়া আরও একটা বাতিক ছিল তার,—পুরানো বই সংগ্রহ করা। পুরানো দোকানদারের চেনা খদ্দের হিসেবে মাসিক কিস্তিতে সে অনেক ভালো ভালো দুষ্প্রাপ্য বই জোগাড় করেছিল।

কিন্তু একদা অনিলের মা দেহ রাখলেন। বয়েস চল্লিশ কিন্তু স্বাস্থ্য ষাটের! অর্থের অনটন আর অসচ্ছলতার নিত্য নির্য্যাতনের সঙ্গে যুদ্ধ চালিয়ে শরীরে ভাঙ্গন ধরেছিল ত্রিশের পরেই। সে বারে শীতে ভিজে কাপড়ে পৌষ-কালী দর্শন করে ঘরে ফিরলেন, সঙ্গে নিয়ে অশেষ পুণ্য এবং অবিরাম জ্বর। দরিদ্রের গৃহে চিকিৎসার সমারোহ না হলেও অনিল সাধ্যমত শুশ্রূষা এবং ওষুধ-পথ্যের ত্রুটি হতে দেয়নি। কিন্তু মা গেলেন। অর্থাৎ আড়ালে চাঁদা তুলে

তাঁকে ঘাটে নিয়ে যাওয়া হল। আর এই মায়ের মৃত্যুর পর থেকে অনিলের সঙ্গে ঘন ঘন দেখাশুনো বন্ধ হল।

আমি তখন কলেজের পাট চুকিয়ে ওকালতির অনশন-ব্রতে দীক্ষালাভ করে পূর্ব্ব-সংযম অভ্যাস করছি আর চাঁপাতলার কোনো এক প্যাঁচোয়া উকীলের পিছনে বিনা-ফী'তে কাজের তাঁবেদারি করছি। এমন সময়ে, হঠাৎ অনেক দিন পরে আদালত-ফেরত ওয়েলিংটনের মোড়ে ট্রামের জন্যে দাঁড়িয়ে নজরে পড়ল অনিলের পরিচিত চলন-ভঙ্গী—দু হাতে বই, ঈষৎ হাসিমুখে আমার দিকে এগিয়ে আসছে। তার মা আমাকে স্নেহ করতেন বলেই হোক্ অথবা তার মনের কোণে আমার জন্যে একটু বিশিষ্ট স্থান ছিল বলেই হোক্, অনিল আমাকে তখুনি বিদায় দিলে না। সঙ্গে করে বাড়ী নিয়ে গেল। ভেতরে গিয়ে দেখি—পূর্ব্বে যেমন ছিল, এখনও প্রায় সেই রকমই। নতুন আমদানীর মধ্যে ঘরের মেঝের ওপর দিয়ে কয়েকটি যথেচ্ছ-বিহারী ছুঁচো। আর একটু হলেই মাড়িয়ে ফেলতাম। নইলে সেই অসংস্কৃত ঘর, কোনো বদল বা উন্নতি হয় নি। আবর্জ্জনা বেশ কিছু জড় হয়েছে আর জমে উঠেছে রাশীকৃত ধূলো-পড়া বই এবং কিছু বঙ-চটা আসবাব। আসবাব গুলো নিকটেই চোরাবাজার থেকে কেনা—বেশ বোঝা যায়। কিন্তু পুরানো হলেও অনিলের রুচির তারিফ না করে পারলাম না। বিশেষ করে নজরে পড়ল একটি সাবেক কালের বাতিদান, শ্বেতপাথরের তৈরী। আর দু তিন খানা ওলড পীস্—যা ওদেশে হলে আশ্চর্য্য দামে বিকোতে পারত।

আর একটা অদ্ভুত চীনে মূর্ত্তি দেখলাম, যার দেহে ভাঁড়ামির ছাপ আর মুখে মৃত্যুর দুর্জ্ঞেয় হাসি।

অনিল কাপড় ছাড়তে পাশের ঘরে গেলে আমি সেই অবসরে তার গ্রন্থসংগ্রহের ওপর চোখ বুলোচ্ছিলাম। একখানা বই নিয়ে নাড়াচাড়া করছি, এমন সময়ে অনিল ঘরে ঢুকল। বললাম "তোর সে 'ছবি' এখনো যায়নি দেখছি।"

অনিল সে কথায় কান না দিয়ে বললে "পুরানো আসবাবের দোকানে একটা ভাঙ্গা কোচের ওপর চেলিনির আত্মজীবনীখানা পেয়েছিলাম। আসল বাঁধাই আর খুব পুরানো সংস্করণ। আট আনার বারগেন্, আশ্চর্য্যি না ?"

দেখ্‌ছি, অনিলের মার মৃত্যুর পর থেকে এ নেশাই জীবনের মেরুদণ্ড হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সেদিন অনেকক্ষণ অনিলের সঙ্গে কাটিয়েছিলাম। গল্পচ্ছলে বুঝলাম যে বাড়ীটা সে শীগ্‌গিরই বিক্রী করতে চায়। এ পুরানো বাড়ীর অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়া কাটাতে না পারলে তার চলবে না। কি কাজ আর বাড়ী নিয়ে! কৈশোর আর প্রথম যৌবনের অপ্রিয় দৈন্য-স্মৃতি সে ভুলতে চায়। মাঝে এটর্নী অফিসে যে কাজটি যোগাড় হয়েছিল সেটী আর নেই। সম্প্রতি নতুন কাজ নিয়েছে এক সওদাগরী অফিসে। পাট এবং তিসির অভিজ্ঞতা দালালি। একা মানুষ—তেমন কিছু অনটন অসুবিধা হয় না। চলে যায় মাঝারি গোছের। ফিরে আসবার সময়ে অনিল বললে, "আসিস্ আবার। আমার জীবনে তো সবই

পুরানো জুটেছে……এবার একটা কিছু নতুনের চেষ্টা করলে হয় না? এতো দিনের সঞ্চিত মায়া কাটাতে হবে শীগ্‌গির। পারি তো খবর দেবো।"

অনিলের অমনস্কতায় আমি যেন একটু আনমনা ছিলাম। তাই তার কথায় ভালো করে কান দিইনি তখন।

মাঝে অনিলের সঙ্গে বছর পাঁচেক আর দেখা হয় নি। পাঁচ কাজে ব্যস্ত থাকার ফলে এবং অনেকটা কুড়েমির জন্যে তার খবর নিতে পারি নি। আর অনিল যে নিজে থেকে যেচে এসে আমার সঙ্গে দেখা করবে, বিশেষ করে' আমি যখন সংসারী হয়ে বসেছি, সে আশা করা বৃথা।

তবু জীবনে বার বার অপ্রত্যাশিতই এসে ধরা দেয়। মাসের শেষে পকেট শূন্যপ্রায়, হঠাৎ দেবতার আশীর্ব্বাদে দু চারটে টাকা মিলে যায়। কি একটা কাজে গিছলাম শ্যামবাজারের দিকে। ফিরবার পথে এক আত্মীয়ের বাড়ীতে যাবার জন্যে রামধন মিত্রের গলিতে ঢুকছি, এমন সময়ে অনিলের সাক্ষাৎ মিলল। অনেক দিনের ব্যবধান, তার পরে এই শীতের সন্ধ্যায় আকস্মিক দর্শন। ছাড়লে না। ধরে নিয়ে গেল তার বাড়ীতে।

অনিল বিয়ে করেছে এবং একটি ছেলেও হয়েছে। আমারই ছেলের সমবয়সী। দেখে-শুনে বেশ খুসী হলাম। অনিলকেও যেন মনে হচ্ছিল সুখী হয়েছে, অন্তত নতুন পরিবেশে পুরানো দিনের দুঃস্বপ্ন ভুলেছে। তবে সওদাগরী অফিসের চাকরী ছেড়ে

এখন নানা কাজ করে বেড়ায়। অর্ডার সাপ্লাই ব্যবসাতে লাভ মন্দ নয়, এর ওপর লজেন্‌স্ এবং পুরানো সেলাই-কলের এজেন্সি নিয়েছে। দু পয়সা মন্দ হচ্ছে না। মোটা অঙ্কের জীবন বীমাও করে ফেলেছে। আর বিয়েটা নাকি রোমাঞ্চকর ব্যাপারের পরিণতি। আমার সঙ্গে যখন অনিলের শেষ দেখা হয় বৌবাজারের বাড়ীতে, তখন তার মন ও হৃদয় নাকি রীতিমত দোল খাচ্ছে লীলার কথায়। দূর সম্পর্কীয়া এক দিদির শ্বশুরবাড়ী বেড়াতে গিয়ে সেখানে ঐ আশ্রিতা মেয়েটিকে তার অসম্ভব ভালো লাগে। নিজের বিগত জীবনের দারিদ্র্য আর ভয়াবহ নিঃসঙ্গতা স্মরণ করে সে অল্পদিনের আলাপেই লীলাকে একেবারে গৃহিণী করে নিলে। তবে কেবল সহানুভূতির তাগিদেই নয়—দুটি সুন্দর ভ্রূ ও তরল চোখের সরল ব্যবহার কিছু কম কাজ করেনি, একথা আমি শপথ করে বলতে পারি লীলাকে দেখার পরে। মেয়েটি সত্যিই ভালো, ওকে দেখলে অনিলের মার কথা মনে পড়ে যায়। তবে মুখের ভাবটা কেমন যেন অন্যরকম—মনে হয় দুনিয়ার রাজ্যের সমস্ত বিষণ্ণতা যেন ঐখানে এসে ভার নামিয়েছে। বড়ো বেশী লাজুক—যদিও আঁচলে ভারী চাবির গোছা। যাক্, অনিল বেশ সহজ ভাবেই নতুন জীবনকে গ্রহণ করেছে, এইটা দেখেই খুসী হলাম।

প্রচুর জলযোগ করিয়ে গলির মোড় পর্য্যন্ত অনিল আমাকে এগিয়ে দিলে। রাস্তায় আস্‌তে আস্‌তে আমায় জিজ্ঞাসা করলে, "তোর বৌ সেলাই-টেলাই জানে বোধ হয় ?"

আমি বললাম "কিছু-কিছু। কিন্তু কেন?"

অনিল বল্লে—"না! এমনি বলছিলাম। মানে, হাতে একটা ভালো কল রয়েছে। অবিশ্যি সেকেণ্ডহ্যাণ্ড, কিন্তু ভালো কনডিশান্—যদি দরকার হয় তাই…" তারপর তাড়াতাড়ি কথাটা চাপা দিয়ে বললে, "আর দ্যাখ্, ইচ্ছে ছিল তোকে বিয়ের সময়ে বলি। কিন্তু আমি কাউকেই নেমন্তন্ন করিনি। বিয়ের পরে ভেবেছিলাম তোকে খবর দিই। কিন্তু সে আর হয়ে উঠল না। তা ছাড়া, তখন কেমন যেন মনটা দমে গিছল। বিয়ের পরে শুনলাম লীলা বালবিধবা। অবশ্যি তার জন্যে আমার ক্ষোভ নেই। তবু—ভাগ্যের পরিহাস, এই আর কি।"

গল্প করছিলাম এক আলাপীর সঙ্গে বাড়ীতে বসে। অনিলের সমস্ত ব্যাপার শুনে তিনি শুধু বললেন "কতো দাম চাইলে? বেশী পুরানো মডেল না হলে সস্তায় যদি পাওয়া যায় তো মন্দ কি! আর একদিন না হয় ঘুরেই আসবেন। যা মাগ্যির বাজার, কোনো জিনিষই তো ছোঁয়া যায় না…দেখবেন একটু…বল্তে কি—বাড়ীর এঁরা তো খোঁজ রাখেন না, কতো ধানে কতো চাল! হামেশাই দেখি মেটেবুরুজের দর্জ্জি যায় আর আসে। একটা সস্তায় কল-টল পেলে কিছু বাঁচে আমার—অন্তত পকেট আর কান। তা আপনার বন্ধুটির বেশ রোমান্টিক কপাল তো! তা আমারও মশায় এককালে পড়াশুনোর বড় সখ ছিল…কিছুই হলনা শেষ পর্য্যন্ত। বেশ আছেন আপনারা…"

তথাগত

তার নাম রাখা হয়েছিল প্রশান্ত।

পাড়ার লোকেরা তাকে ডাকত 'বিচ্ছু' বলে এবং আড়ালে আরো অনেক সুমিষ্ট বিশেষণ প্রয়োগ করত। মা ডাকতেন—'শান্ত'

নিজে ছিলেন ছোটোখাটো মানুষটি। কারুর সঙ্গে কখনো উঁচু স্বরে কথা কন্ নি। সংসারের যেদিক্‌টা কুৎসিত আর কদর্য্য, সেদিক্‌টা তিনি সযত্নে এড়িয়ে চল্‌তেন। অশান্তির মধ্যে বাস করতে হ'লেও তাঁর মুখে ছিল পরম সহিষ্ণুতার আভাস। লোকে দেখে ভাব্‌ত—মেয়েমানুষ অথচ কথা কাটাকাটির প্রতি বীতরাগ!

প্রশান্ত তখনো ভূমিষ্ঠ হয় নি। অলস ও মন্থর প্রতীক্ষার দিনগুলি কাট্‌ত শুধু একা একা বই পড়ে। বুদ্ধের জীবনী ও বাণী ছিল তাঁর কাছে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আকর্ষণের সামগ্রী। দৈহিক যন্ত্রণা ও মানসিক দুর্ব্বলতা যখন অসহ্য হয়ে উঠ্‌ত, সযত্নে রক্ষিত ভগবান্ তথাগতের ধ্যান-সম্বুদ্ধ মূর্ত্তির দিকে নির্নিমেষ নয়নে তাকিয়ে থাক্‌তেন। মনের কোণে অস্ফুট বাসনা অঙ্কুরিত হ'ত—যদি ছেলে হয়, যেন অমনি সুঠাম দীর্ঘায়ত দেহে ঐ রকম নিরাবিল শান্তি আর করুণা…

এই হ'ল পুত্রের নামকরণের গোপন প্রেরণা ও সাধারণ ইতিহাস।

মায়ের সকল কামনা বিফল করে ছেলে বড়ো হয়ে উঠ্‌ল। মুখটি মায়ের মতই কোমল ও নিরীহ—কিন্তু তারি অন্তরালে দুরন্ত প্রকৃতি। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত পাড়ার গৃহস্থদের বাড়ী থেকে অভিযোগ আসে। কোনো বাড়ীর ছোটো মেয়েকে অকারণে মেরে এসেছে, কি অপর কারুর সখের জিনিস ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়েছে—এই সব প্রাণান্তকর নালিশ শুনে শুনে মা বিপর্য্যস্ত হয়ে ওঠেন। ভাবেন—শান্তর মতি-গতির পরিবর্ত্তন হবে কবে? জগতের সব বালকরাই অবুঝ, চঞ্চলতা আর ক্ষতি করবার প্রবৃত্তি তাহাদের সহজাত। কিন্তু সব চেয়ে মন পীড়িত হয়, যখন কানে আসে শান্ত ঝগড়া করেছে কিংবা কাউকে কিছু কটু কথা বলে এসেছে। বিরোধ যার স্বভাব বিরুদ্ধ, তারি ছেলে এমন স্বভাব পেলো কোথা থেকে।

শান্ত সন্ধ্যাবেলায় ঠিক্ নিয়মিত সময়ে বাড়ী ফিরে আপনার পড়বার ঘরে আলোটি জ্বেলে বই নিয়ে বসে। পড়াশুনায় তার কোনো অবহেলা বা শৈথিল্য নেই। এই বয়সের মধ্যে সে অনেক কিছু পড়েছে—প্রয়োজনীয় ও অবান্তর, এবং ছাপার হরফে যা কিছু বেরোয় আর হাতের কাছে পায় তা পড়তে তার রীতিমতো ভালোই লাগে। পুরুষ-অভিভাবকেরা মার-ধোর করবার সুযোগ অথবা উপলক্ষ্যই পান্ না। কাজেই তাঁরা সব নালিশ হেসে উড়িয়ে দেন—ছেলেমানুষ, বয়স হ'লেই সেরে যাবে।

মায়ের পদশব্দ শুনে শান্ত চকিত হয়ে ওঠে। মার বকুনির

চেয়ে তাঁর মিষ্ট বুক্‌নিকে সে ঢের বেশী ভয় করে, তাঁর শুষ্ক ও ব্যথিত মুখ তাকে রীতিমতো পীড়িত করে। মা আড়ালে অনেক বোঝান, বলেন—"আমার গা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা কর্ তুই, আর কখনো পরের বাড়ীতে অমন করে উৎপাত করবি না, ঝগড়া করবি না……"

মায়ের অশ্রুসজল চোখের দিকে তাকিয়ে শান্ত'র মন অনুতপ্ত হয়। কথামত গা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করে। তারপর উদ্বেগ যায় উড়ে, মার হাসিমুখ দেখে ভরসা আসে। হঠাৎ অপ্রস্তুতের হাসি হেসে জড়িয়ে ধরে, বলে—"আমাকে একটা ছবি আঁকবার জন্যে রঙের বাক্স কিনে দেবে মা? টুনুর কাকা কিনে এনেছে দেখ্‌লুম। বেশী দাম নয় মা মোটেই—আর একটা কথা বল্‌বো, মা, রাগ করবে না বলো তুমি?"

"না করবো না—বল্ না কি?"

"আজ রাত্রে কিন্তু আমি দুধ খেতে পারবো না। পেট এম্‌নি ভরে গেছে, বাব্‌বা। তুমি এই দেখো না হাত দিয়ে—"

রাত্রে বিছানায় শুয়ে শুয়ে গল্প শোনে সে। মার মুখে সেই একই গল্প কতোবার শুনেছে, তবু পুরানো হয় না।

গল্প বলা চলে, রাতের অন্ধকারে মশারীর মধ্যে। বাইরের বর্ষার জোলো হাওয়া এসে ঝাপ্‌টা মারে, শান্ত ততোই গলা আঁক্‌ড়ে ধরে মার বুকের মধ্যে সেঁধিয়ে যায়।

"একবার কী একটা যোগ উপলক্ষ্যে সহরে অনেক সন্ন্যাসীর আমদানী হয়েছিল। আমি তখন ছোট্টো, কিন্তু বেশ স্পষ্ট মনে পড়ে পাড়ার লোকে সবাই সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছিল। এক জনদের একটি ছোটো ছেলে হারিয়ে যায় সেই সময়ে। গুজব উঠ্‌ল ছেলেধরা এসেছে। সাধু-সন্ন্যাসীর বেশ ধরে তারা ছেলে-মেয়েদের ভুলিয়ে নিয়ে যায়। সকলেই সাবধানে থাকে, সন্ধ্যার পর বিশেষ করে ছোটো ছেলেরা বাইরের দিক্ মাড়ায় না। মাঝখানে কিছুদিন বিনা উপদ্রবে কেটে গেলো। ব্যাপারটা একটু পুরানো হয়ে এসেছে, আর সাধারণের সে আতঙ্ক-ভাবও অনেকটা গেছে কমে। এমন সময়ে জনরব উঠ্‌ল—রাত্রে গলির মধ্যে ঝাঁক্‌ড়াচুলো সন্ন্যাসীকে ঘুরে বেড়াতে দেখা গিয়েছে। পরণে রক্তাম্বর, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। কপালে সিঁদূরের মস্ত বড়ো ফোঁটা। কেউ বল্‌লে—ছিঁচ্‌কে চোর, ভেক নিয়েছে। কেউ বা বললে—তান্ত্রিক, মারণ-যজ্ঞ করতে এসেছে।

"মারণ-যজ্ঞ কি মা ?"

"বল্‌ছি—শোন্ না। সে ভয়ানক ব্যাপার। কামরূপে অনেক তান্ত্রিক আছে, তারা যোগ-তপ করে। ভীষণ ক্ষমতা তাদের। অনেকে বলে মন্ত্র-তন্ত্রের জোরে তারা মরা মানুষকে বাঁচাতে পারে, আবার দিব্যি জোয়ান লোককে এক মুহূর্ত্তের মধ্যে মেরে ফেলতে পারে।

"একদিন আমার জ্বর হয়েছিল। মাথার খুব যন্ত্রণা, ভালো করে ঘুম হচ্ছে না। চুপ্ করে বিছানায় শুয়ে আছি। এমন

সময়ে স্পষ্ট শুনতে পেলুম, আমার নাম ধরে কে যেন ডেকে উঠল। আওয়াজ থেকে বুঝতে পারলুম—খিড়কীর দরজার কাছে কেউ ডাকছে। উত্তর দিলুম না. চুপ করে বিছানায় উঠে বসে রইলুম। অপেক্ষা করতে লাগলুম, সত্যি আবার কেউ ডাকে কিংবা জ্বরের ঘোরে নিজেই স্বপ্ন দেখছি কিনা। কিছুক্ষণ পরে আবার সেই ডাক এল। এবার কিন্তু আর সন্দেহ রইল না। পরিষ্কার আমার নাম ধরে ডাকছে। একবার ভাবলুম, উত্তর দিই—জিজ্ঞাসা করি, কে? কিন্তু ভারী ভয় হ'ল! শেষে ঠিক করলুম, দেখতে হবে—এতো রাত্রে কে ডাকাডাকি করে! আস্তে আস্তে পা টিপে বাবার ঘরের জানলা খুলে মুখ বাড়িয়ে দেখি······

"লাল কাপড়-পরা সন্ন্যাসী?" শান্ত রুদ্ধশ্বাসে জিজ্ঞাসা করে।

"হ্যাঁ। আমি তখন এক দৌড়ে ছুটে এসে বাবাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদেই আকুল। তারপর সোর-গোল পড়ে গেলো সারা বাড়ীতে। বাবা, কাকা, ছুট্তে ছুট্তে নীচে নেমে গেলেন। সন্ন্যাসীটা শব্দ শুনে তখন বেগতিক বুঝে পালাচ্ছে। কিন্তু পাড়ার ছেলেরা এদিকে আওয়াজ পেয়ে ততক্ষণে রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছে। তখন তাকে ধরে কী মার!"

"কেন এসেছিল, মা······?"

"পরে শুনলুম, সহরের কোনো এক নামজাদা বড়লোকের মেয়ের ভারী অসুখ। ডাক্তারেরা জবাব দিয়ে গেছে। জীবনের আর কোনো আশা নেই দেখে কামরূপ থেকে তান্ত্রিক আনিয়ে-

ছিল, মারণ-যজ্ঞ করবার জন্যে। মাঝ-রাত্রে তান্ত্রিক করে কি,— না একটা সরা নিয়ে তার ওপর আর একটা সরা উপুড় করে চাপা দেয়। তারপর সেটা হাতে করে' নিয়ে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে বেড়ায়। ওরা সব জানে কি না,— কার পরমায়ু বেশী। তাই তার বাড়ীতে গিয়ে নাম ধরে ডাকে। তিনবার ডাকবে—তার মধ্যে যদি সাড়া দিয়ে ফেলে, তা হ'লেই সর্ব্বনাশ। মন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে তার পরমায়ু চুরি করে' সরা চাপা দিয়ে নিয়ে যায়! যার অসুখ সে বেঁচে উঠ্‌বে—আর যে ডাকের জবাব দেবে, সে যাবে মরে।

"ভাগ্যিস্! তুমি উত্তর দাও নি মা, নইলে কী হ'ত? কিন্তু তুমি অনেকদিন বেঁচে থাক্‌বে—সত্যি দেখো……"

"হ্যাঁ, তা হলে আমায় জ্বালাতে সুবিধে হয়! কিন্তু কী করে জানলি তুই, শান্ত?"

"তা না হ'লে সন্ন্যাসী তোমার নাম ধরে ডাক্‌লে কেন? নিশ্চয়ই জান্‌ত তোমার পরমায়ু খু-উ-ব বেশী।"

মা হেসে শান্তর মাথায় হাত বুলিয়ে দেন। ওর বুদ্ধি-শুদ্ধি বেশ ভালোই—কিন্তু সুবুদ্ধি যে কবে হবে তা অন্তর্যামীই জানেন।

কিন্তু এ সব কাহিনী অনেকবার শুনে শুনে মুখস্থ হয়ে গেলেও শান্তর তৃপ্তি আর হয় না। সব চেয়ে ভালো লাগে তার মার ছোট বেলাকার কথা।

যখন দাদামশাই ছেলেমেয়েদের নিয়ে মার্কেটে যেতেন বেড়াতে, মা একটা পুতুলের দোকানে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতেন। কতো রঙ-বেরঙের পুতুল—আর কী সুন্দর দেখতে সব! কোনোটা চমৎকার ফ্রক্-পরা, কোনোটার সোনালী চুল, আবার কোনোটার বা চোখ মিট্‌মিট্ করে। ইচ্ছে করত, একটু ছুঁতে। কিন্তু মামারা তাড়া দিতেন, বলতেন—'হাঁ করে কী দেখ্‌ছিস্ অতো?'

একবার দাদামশাই-এর সঙ্গে মা একলা গিয়েছেন বেড়াতে। মার্কেটের সেই দোকানের সাম্‌নে যেই দাঁড়িয়ে পুতুলগুলো দেখ্‌ছেন, অম্‌নি ভেতর থেকে সাহেবী পোষাকপরা পার্শী দোকানদার বেরিয়ে এসে কতকগুলো প্যাটিস দিয়ে বল্‌লে—'খুকী, নাও।' দাদামশাই অনেক না-না করলেন কিন্তু নিতেই হ'ল। দোকানদার ছাড়লে না। সে ভেবেছিল খুকীর বুঝি প্যাটিস্ খেতে ইচ্ছে হয়েছে।

"কিন্তু মা,—প্যাটিস্ ও ত ভালো।"

"তা, ভালো হলে কি হয়—আমি ত পুতুলই ভালোবাসতুম্। আর এম্‌নি বোকা ছিলুম্ যে মুখ ফুটে বাবার কাছে বল্‌তে পারতুম না। তাই প্যাটিস্ খেতে খেতে বাড়ী এলুম্...কতো দিন রাত্রে পুতুলটাকে স্বপ্নে দেখ্‌তুম—আদর করছি তাকে কোলে করে। কিন্তু তোরা যে আজকাল প্যাটিস্ খাস্ শান্ত, তার চেয়ে ঢের ভালো ছিল। এমন মুচ্‌মুচে......

সেদিন বিকেলে পড়ার ঘরে গোলমাল শুনে মা ভাবলেন যে শান্ত আবার নিশ্চয়ই কিছু অপকীর্ত্তি করে এসেছে। এগিয়ে গিয়ে দেখেন—যা ভেবেছেন, ঠিক্ তাই। স্কুলে যাবার সময়ে টাকা দেওয়া হয়েছিল বই কেন্‌বার জন্যে। বই আসেনি, অথচ টাকার কি হয়েছে বল্‌তে পারে না। তার ওপর অনেক দেরী করে বাড়ী ফিরছে। তর্জ্জন-গর্জ্জন সব বৃথা। সেই যে মুখ বন্ধ করে শান্ত দাঁড়িয়ে আছে—কোনো জবাব দেয় না। নীরবে তিরস্কার ও মার-ধোর সহ্য করছে অথচ কোনো কৈফিয়ৎ দেয় না।

গৃহস্থালীর কাজের অবসরে মা চোখের জল ফেলেন। ভাবেন, যেটি সব চেয়ে ঘৃণার বিষয়, সেইটিই কিনা শান্ত করে বসে! টাকার কী দরকার ওইটুকু ছেলের! কি প্রয়োজন থাক্‌তে পারে—ভেবে কূল কিনারা পান্ না। এই বয়সে যদি ও অসৎসঙ্গে পড়ে, পরিণাম তা হলে কি হবে? এখনও ত সামনে আস্ত জীবন পড়ে রয়েছে!

রাত্রে পড়বার ঘরে ঢুকে শান্তকে কাছে ডাক্‌লেন। জিজ্ঞাসা করলেন,—"কি হয়েছে খুলে' বল্!"

কোনো উত্তর নেই।

শেষে অনেক মিষ্টি কথায় তুষ্ট করে বল্‌লেন—"আমায় চুপি চুপি বল্। কোনো ভয় নেই—কাউকে বল্‌বো না।"

অনেক খোসামোদের পর শান্ত উঠে ডেস্কের ভিতর থেকে বা'র করে মার সাম্‌নে রাখ্‌লে একটা কাগজের বাক্‌স, আর একটা ব্রাউন পেপারের ঠোঙা।

মা খুলে দেখলেন—নীল-চোখ, সোনালী-চুল, ফ্রক্-পরা মস্ত একটা পুতুল। ঠোঙার মধ্যে ঠাণ্ডা মটন্ প্যাটিস্।

জিনিষগুলো হাতে নিয়ে মা চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন। মুখে কোনো কথা জোগালো না।

শান্ত'র লজ্জিত ও সকরুণ মুখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে হঠাৎ একটা অর্দ্ধবিস্মৃত পুরানো স্মৃতি ভেসে এল। ভেসে এল মনের কোণে সেই অস্ফুট দোহদ বাসনা……

শেষ চিঠি

কল্যাণীয়াষু,

গান্ধিজী যবে থেকে আইন-অমান্য আন্দোলন প্রচলিত করলেন, তখন থেকেই দেশের হাওয়া বইতে লাগ্লো ভিন্ন ভাবে। ছেলেরা শেলী-কীট্‌স্ ছেড়ে আরম্ভ করলে অতি ময়লা নূন তৈরী আর মেয়েরা হাঁড়ি-হাতা-খুন্তি ত্যাগ করে সুরু করলে দেশী দ্রব্য প্রচার। ছেলে আর মেয়ে—উভয়ের মধ্যে সম্বন্ধটা সহজ আর সরল হয়ে দাঁড়ালো। সেই তথ্যটাই এ যুগের পরম লাভ। সৌখিন ড্রয়িং রুমের মিষ্টি হাসি আর স্মার্ট কথার ফোড়ন দেওয়া প্রেমালাপ গেলো ঘুচে। সে ভালোবাসা প্লীবিয়ান্ হয়ে নেমে

এলো সদর রাস্তায়, ট্রামে-বাসে, হাটে-মাঠে। সঙ্কোচ আর আভিজাত্য গেলো কেটে, তাতে সনাতনীর দল হিন্দুয়ানি উচ্ছন্ন গেলো বলে এতো বড়ো-বড়ো সমাস-জড়িত ঋষিদের আপ্তবাক্য আওড়াতে লাগ্‌লেন যে, ভুলে গেলেন—ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাসে বৈদিক আর পৌরাণিক যুগেও সমাজ বলে একটা জিনিষ ছিলো, যে সমাজের অপভ্রংশ হলো আধুনিক সমাজ, যেখানে সংস্কার একরকম আর কাজ-করা হয় অন্য রকমের। কিন্তু তখনকার কালে দেশের নৈতিক চরিত্র এমন কিছু জাহান্নামে—থুড়ি, হিন্দুদের কুম্ভীপাক নরকে পতিত হয়নি। যবে থেকে মেয়েদের হাতে পড়লো কড়া, আর মুখে ঘোম্‌টা—তবে থেকে সমাজ গেছে বদ্‌লে। আব্রু আর পরদা জিনিষটা সম্পূর্ণ মোগ্‌লাই খানা, শুনেছি। খেতে খেতে, সেই খানাই এখন পবিত্র বিশুদ্ধ হিন্দু-হোটেলের গঙ্গাজলে-রান্না আহার্য্যে দাঁড়িয়েছে। আমাদের স্বদেশী রুচি আর সংস্কার একপ্রকার রুটি বা পরোটা-জাতীয় পদার্থবিশেষ। ঘি-জল দিয়ে টান্‌লেই বাড়ে। সুবিধামত শাস্ত্রও আমাদের দেশে রঙ্ বদ্‌লায় বহুরূপীর মতো। আর আমাদের শাস্ত্রের অর্থই হচ্ছে লোকাচার—যেটা ভাটপাড়া, নবদ্বীপ, বিক্রমপুরে জন্মেছিলো এবং সুদূর মধ্যযুগে বল্লাল সেন কৌলীন্য দিয়ে তার রাখীবন্ধন করেছিলেন। উনিশ শতক থেকে এ-সব বিশ্বাসে ভাঙ্গন ধরেছে, এখন কিছুই নেই। আশ্চর্য্য হলুম শুনে তোমাদের বাড়ীর কথা। মেয়ে পড়ে কলেজে, আধুনিক শিক্ষায় দীক্ষা দেওয়া হয়েছে,

অথচ বিবাহ-ব্যাপারে বিশ্বাস আছে ষোলো-আনা সেই ষোড়শ শতাব্দীর সংস্কারযুক্ত সমাজের প্রক্রিয়ায়। নামাবলীর সঙ্গে নেক্‌টাই! মন্দ নয়।

পুরাতনপন্থীদের আর একটা ধুয়ো হল যুবতী মা-দের চরিত্র আর রইলো না! যত থাকতো আগে, যখন কুলীনপ্রবর ব্রাহ্মণের দল অষ্টম হেন্‌রীর মত একসঙ্গে ছ'টা মেয়ের কম বিয়েই করতো না! হাতে থাক্‌তো একখানি লাল সুতো-বাঁধা মুদীর খাতা। তাতে বর্ণানুক্রমিক সূচী সাজানো থাকতো—শ্বশুর বাড়ীগুলোর নাম, ধাম ও ঠিকানা। একজনের শুনেছি ষাটটা সহধর্ম্মিণী ছিলো। ভাগ করে দেখো, ক'দিন করে বরাতে পড়ে। বছরে ছ'দিন এক এক শ্বশুরালয়ে স্থিতি, বিদায়-কালে ধুতি-চাদর; নগদ দক্ষিণান্ত বিদায়,—ভদ্রলোকের অন্য কোনো প্রোফেশ্যন্-এর দরকার হয়নি। এই প্রসঙ্গে একটা পারিবারিক গল্প মনে পড়ে গেলো।

আমি শুনেছি বাবার মুখে, তিনি শুনেছিলেন ঠাকুমার কাছে। সুতরাং গল্পটা সত্যি, অনুমান করা যেতে পারে। আমার প্রপিতামহ ৺বৈকুণ্ঠনাথ ছ'টা বিয়ে করেও বৈকুণ্ঠে যাবার পথ পরিষ্কার করতে পারলেন না। একে কুলীন, তায় সেকালের ফার্শী-পড়া আদালতের নাজীর। ফট্ করে মাথায় বুদ্ধি খেলে গেলো—ছেলের আরো একটা বিয়ে দিতে হবে। ঠাকুমার বয়স তখন তেরো, ঠাকুরদার আঠারো। অপরাধ, সন্তানাদি হওয়ায় অযথা বিলম্ব। ঠাকুরদা মশাই

ছিলেন একনিষ্ঠ প্রেমিক, বঙ্কিম চাটুজ্যের সমসাময়িক, আবার ইংরেজী শিক্ষিত। তিনি যে বালিকা-বধূর অভিমানী মুখখানি দেখে ভুলবেন, এ আর আশ্চর্য্য কি! নতুন সম্বন্ধটি হয়েছিলো এক দারোগার মেয়ের সঙ্গে। তুমি হয়তো জানো না—সে-যুগে দারোগা বাবুর মর্য্যাদা ছিলো বেদান্ত-উপনিষদের ব্রহ্মের চেয়েও বড়ো। ঠাকুমা আগামী সতীনের বাপের বাড়ীর লোকদের জন্যে রান্নাঘরে রান্না করছিলেন,—সেই সুযোগে আঠারো বছরের স্বামী তাঁর সঙ্গে লুকিয়ে দেখা করে সান্ত্বনা দিলেন—"ভাবনা কি? বিয়ে ত আমাকেই করতে হবে। আর আমি যদি বেঁকে বসি বা পালাই, কে কি করবে? তুমি ভয় পেয়ো না, মন দিয়ে বাঁধো।"

অতিথিরা যখন আহারে বসে বৌটীর রান্নায় উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করছেন, তখন ঠাকুরদা মশাই তাঁর পিতৃদেবের আড়ালে তাঁদের বললেন, "এমন ভালো রাঁধুনীর সতীন হলে আর এ রকম খাবার জুটবে?" তারপর সেখান থেকে বেরিয়ে পড়ে, খিড়কীর দরজা দিয়ে ঠাকুমাকে সঙ্গে নিয়ে ছ' সাত মাইল দূরে এক জ্ঞাতি-ভ্রাতার বাড়ীতে কিছুদিন অজ্ঞাতবাস করলেন। অপ্রীতিকর ব্যাপারটার পুনরাবৃত্তি হয় নি, ঐখানেই চাপা পড়ে যায়। এদিকে আহারান্তে গোঁফ মুছে, দারোগাবাবু দেখলেন, ভাবী জামাতা ফেরার! তিনি কি মন্তব্য করেছিলেন—তা জানা যায় না। তবে অভিশাপ দিয়েছিলেন সুনিশ্চিত, এ কথা

শপথ করে বলতে পারি। অন্ততঃ তোমার পাণি-প্রার্থনা করে সামাজিক বাধার ওজরে বিড়ম্বিত হওয়া, এ তারি প্রতিফল!

দেখো, মেয়েরা যখন আঘাত করে পুরুষকে, তখন সে-আঘাত লাগতে পারে দুটো যায়গায়। একটা হল উদরে—সেটা স্থূল রকমের আঘাত। রান্না, পরিচর্য্যা আর সেবা দিয়ে। আর একটা হল বুকে। সেটা সূক্ষ্ম রকমের মার, কিন্তু শক্তিশেলের চেয়ে কম মারাত্মক নয়। তবে সেবিকাই হোক, আর প্রেমিকাই হোক, আন্তরিকতা চাই আর চাই চরিত্রের দৃঢ়তা। সামাজিক বন্ধন কিংবা মুখের কথা, তার চেয়েও অন্তরের সত্য অনেক বড়ো —এটা সব সময়ে মনে রাখা উচিত। আজকালকার মেয়েরা ফণিনীর মত বেণীই বাঁধে, কিন্তু ফোঁস করে না—কামড়াতেও ভুলে গেছে বোধ করি। নইলে অন্যায় অবিচার জেনে, শুনে, বুঝেও নির্ব্বিচারে মেনে নেয় আর মুখ বুজে সহ্য করে কেন? আমার সন্দেহ হয়, আমাদের মাতামহী-পিতামহীদের মতো তারা কোনো একটি কেন্দ্র ধরে জীবন চালিত করতে প্রস্তুত নয়। ভালোবাসা জিনিষটা ছেলেখেলা নয়। ভালোবাসতে জানা চাই, ভালোবাসাতে শেখা চাই। এ দুটো শিক্ষা যার হয়েছে, সে-মেয়ের আর বিশেষ কিছু করবার শেখবার নেই। আমার ত মনে হয়, আধুনিক মেয়েদের মনের আকুলতা গেছে কমে। তাদের মাথা ঠাণ্ডা, তারা সুস্থ, স্থির, ভদ্র, সংযত। কিন্তু শিক্ষার ফাঁকে হৃদয় গেছে হারিয়ে। যাকে চায়, মনে মনেই চায়—কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত নামতে সাহস পায় না। আমি আর যাই হই, স্ত্রী-বিদ্বেষী নই।

সব মেয়েই কিছু এক ছাঁচে তৈরী নয়, তা জানি। দুটো-চারটে উদাহরণ চোখে যা পড়ে, তারি থেকে একটা সাধারণ মন্তব্য খাড়া করা নিতান্তই অযৌক্তিক মনে করি। তবে সত্যি কথা হচ্ছে, আমার চোখে তোমার কথাটাই বড়ো হয়ে দেখা দিচ্ছে। তা সত্ত্বেও স্বীকার করছি, এমন কয়েকটি মেয়ে দেখেছি যাদের পরে শ্রদ্ধা আমার অসীম। যা তাদের মনের কাছে সত্য বলে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে, সেই অনুসারে তারা কাজ করেছে। অর্থহীন, যুক্তিহীন বিধি-নিষেধের মানা শোনেনি, এবং তার ফলে যে-পুরুষের জন্য তারা স্বার্থত্যাগ করেছে, তাদের নিয়ে অসুখী হয়নি। মেয়েরা যখন সহসা মাথা নেড়ে বলে 'ভালোবাসি', তখুনি আমার সন্দেহ হয়। প্রশ্ন জাগে 'সত্যি, চিনেছো আপনাকে, বুঝেছো এ জিনিষ খাঁটী?' একটা কথা মনে রেখো—ভালোবাসা বাবোমেসে পেঁপে নয়। হঠাৎ ভালোবাসা আর সমাজ, এই কথা নিয়ে তোমায় লেক্‌চ্যর দিতে বসে গেলুম কেন, নিজেই বুঝতে পারছি না। বোধ হয় মন খারাপ, কোনো কাজে মন বস্‌ছে না। তপ্ত দুপুরে বাগান থেকে যুঁইফুলের গন্ধমেশা ঈষৎ-আকুল বাতাস ভেসে আসছে, তোমারি স্নিগ্ধ, স্থির হৃদয়ের মতো। তাই লিখতে বসেছি চিঠি আজেবাজে কথায় ভর্ত্তি করে। এ হলো, এ হলো এক কথায় ·· কিছু না! তোমার অন্তরে যে সর্ব্বগ্রাসী দৈন্য, সেই দৈন্য আমার বিশাল, নিষ্কলুষ ভালোবাসার গাঁথুনিতে ফাটল ধরিয়েছে। সেখানে গজিয়েছে অবিশ্বাস, অভিমান আর ভুল-বোঝার শিকড়।

তুল্‌তে চেষ্টা করছি আর ভুলতে। কিন্তু এই চঞ্চল আর ক্ষীণায়ু প্রাণবস্তু নিয়ে সুখী হবে কি?

আর ছাখো—পুরুষের আকাঙ্ক্ষা আর মেয়েদের চাওয়া, এ ছুটোর মধ্যে আছে অনেক তফাৎ। সেই মূলগত পার্থক্য বুঝলে জীবনের জটিল গ্রন্থিগুলো আসে সরল হয়ে। মেয়েরা ভাবে যা চাওয়া যায়, তাই কি সব সময়ে পাওয়া যায়—না পেতে হবে?. পাওয়ার চেয়ে চাওয়াটাই তাদের কাছে মধুর। আমি বল্‌বো যে খাঁটী ছেলে, সে অমন আলুনী মিষ্টি নিরামিষ ভালোবাসাতে তৃপ্ত হয় না। বেশীর ভাগ মেয়েই ডীফীটিষ্ট—পরাজয় মেনে নেয় সহজেই, সেই কারণে শুধু চাওয়াকেই আঁকড়ে ধরে।

কিন্তু যদি না পাওয়াই গেলো, সে-চাওয়া যে তেতো হয়ে যায়। লগ্ন যদি ফুরিয়ে যায়, মালায় কী কাজ? মালিনী হয় তো চাইবে ঐ বাসি ফুলেই মালা গাঁথতে। আপন মনে গুন্‌গুনিয়ে গাবে গান আর পাবে সান্ত্বনা। কিন্তু যে মালাকর, সে অস্থির হবে তার সাধের ফুলের ছুর্দ্দশা দেখে, আর অধীর হয়ে সারা মালঞ্চটাই ভেঙ্গে চুরে মাথা ঠুকে মরবে। ছুটো বিরুদ্ধ প্রকৃতি, স্বভাবেরই কারসাজি। কাউকেই দোষী করা যায় না, যদিও নৈরাশ্যে আর অবসাদে পুরুষের সমস্ত স্পৃহা, আবেগ যায় নষ্ট হয়ে। মেয়েদেরও লাগে আঘাত। কিন্তু ঝড়ের আগে তারা মাথা নোয়ায়, তাই ঝরে পড়ে না।

আর একটা কথা, মেয়েরা ভালোবাসা কথাটার অর্থ ভুল করে। যখন কাউকে তারা পছন্দ করে—তাদের সিম্‌প্লি ভালো

লাগে, তখন ভাবে এইটাই বুঝি ঠিক্ জিনিষ। যেমন তুমি। আর ছেলেটি অল্প পরিচয় পেয়েই ভাবে, কি অপার ঐশ্বর্য্য পেলুম! এইটাই আসল জিনিষ, এরি প্রতীক্ষায় বুঝি সারা জীবন বসেছিলুম! দু'তরফেই ভুল—তাতেই ট্র্যাজেডির উৎপত্তি। ভালো যখন লাগে, তখন এমনিই লাগে, একতরফা জিনিষের মতো। তাতে আছে মনের খোরাক, কাজেই স্বার্থের স্পর্শ। আর বোধ হয় একটি নতুন জিনিষের প্রতি অতি স্বাভাবিক কৌতূহল। কিন্তু যখন দু'জনের একসঙ্গে পরস্পরকে ভালো লাগতে থাকে, স্বার্থলেশ থাকে না, অপমান, লজ্জা, অভিমান বিসর্জ্জন দেওয়া যায় পরস্পরের মুখ চেয়ে, সেই মুহূর্ত্তে ভালো-লাগা হয়ে যায় ভালোবাসা। বুঝলে?

এতো থিওরির মারপ্যাচ বোধ হয় ভালো লাগছে না। যাক্, ওসব তত্ত্বকথা। প্রেম ব্যাকরণজাতীয় জিনিষ নয়। নিয়ম আর সূত্র সব জায়গায় খাটে না। তবে তুমি আমার কাছে বিস্ময়—চিরকালের চেনা-অচেনার বিস্ময় থেকে যাবে। তুমি হলে নিপাতনে-সিদ্ধ। তোমার বেলায় আইন-কানুন খাটে না। খুব স্থির হয়েই চিঠি লিখছি, কোন রকম ঝাঁঝ নেই মনে। আছে কেবল অবসাদের দারুণ শূন্যতা। কী দিয়ে মন ভরাই বলতে পারো? ছাই-পাঁশ লিখে আর কি হবে? একদিন তোমায় সবই বলেছিলাম। তুমিও বলেছিলে—জেনেছো আমাকে। কখনো অবিশ্বাস অশ্রদ্ধা করবে না। সেইটুকুই ভরসা।

তোমার বিশেষত্ব কি, জানো? আনত মুখে অদ্ভুত নরম হাসি,

না মন্থর গতির মাধুর্য্য, না লীলায়িত কথার অস্ফুটতা, না ভীরু সঙ্কোচ ? সব গুলোই। উপরন্তু তোমার বাড়ন্ত দেহে ফুলন্ত মুখ। তোমার শরীর হল বয়স্থা মেয়ের, মুখ হল কচি শিশুর। এই অদ্ভুত মিলন আমায় অবাক করেছিলো।

ফরাসী সাহিত্যিক মোপাসাঁ প্রেমিকদের সাবধান করে দিয়েছিলেন, এই জাতীয় মেয়েদের সম্বন্ধে। বলেছিলেন, এরা খুব স্থির, কিন্তু হৃদয়ের অনুভূতি কম। সুখ পাওয়া যায় না, এদের কাছে। হয়তো সত্যি !

তবু বিদায়-কালে কৃতজ্ঞচিত্তে ঋণ স্বীকার করি। তোমার অকল্যাণ কামনা কখনো করতে পারবো না। একদা তোমাকে আপনার বলে জেনেছি, আর তোমার অন্তর-লাবণ্যের স্বরূপ নিয়ে নিভৃতে কথার পর কথার মালা গেঁথেছি, না ? সে কথা ভোলা যায় কি ?

তোমার বলবার কিছু নেই, জানি। তবু জানাচ্ছি জবাবের প্রয়োজন নেই।

ইতি